REGISTERED No. C 116.

আলোচনা

...ও সমালোচনা।

একত্রে ১।০ টাকায় পাইবেন। মাশুল স্বতন্ত্র।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ;—
শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক শ্রীতারকনাথ সরকার,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও সম্পাদক।

৪র্থ বর্ষ। } বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল। { ১ম, ২য়, সংখ্যা

সূচী।

(প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

কলিকাতা।

৯নং মজাপুর ষ্ট্রীট, বঙ্গভূমি কার্য্যালয় হইতে
শ্রীগোরাচাঁদ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩০৭ সাল।

[অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র] [প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ আনা]

পানের

জন্য

তাম্বুলীন

পানের

জন্য

তাম্বুলীন

পানের

জন্য

তাম্বুলীন

পানের

জন্য

তাম্বুলীন

নূতন সখের জিনিষ
নূতন সখের জিনিষ

তাম্বুলীন

বহুমূল্য মৃগনাভী, অটোডি রোজ এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট মশলা সংযোগে এই তাম্বুলীন প্রস্তুত হইয়াছে। অতি সামান্য পরিমাণে এই চূর্ণ পানের সহিত ব্যবহার করিলে, পান অত্যন্ত সুরস এবং উপাদেয় হইবে। তাম্বুলবিলাসীরা এই তাম্বুলীন ব্যবহারে যার-পর-নাই প্রীত হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একবার তাম্বুলীনের রস আস্বাদন করিলে তাম্বুলীনবিহীন পান পছন্দ হইবে না।

তাম্বুলীন ব্যবহার করিলে ধনের চাউল, লবঙ্গ, এলাচ ইত্যাদি অন্য কোন মশলা ব্যবহার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা মাত্র।

ব্যবহার করিয়া দেখুন
ব্যবহার করিয়া দেখুন

এইচ, বসু, পারফিউমার ;

৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩০৭ সাল। { প্রথম সংখ্যা।

বর্ষারম্ভ।

কাল আবহমান কাল ঠিক সম ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। ইহার অপ্রতিহত গতি রোধ করা কাহার সাধ্যায়ও নহে। তুমি যতই বাধা দাও না কেন, যতই প্রতিবন্ধকতাচরণ কর না কেন, কাল কাহার কথা শুনিবে না, কোন বাধাই মানিবে না, আপন মনে, সেই একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মন্থর গমনে সেই অনন্ত কাল গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। কালে কিছুই থাকে না, থাকে কেবল স্মৃতি, স্মৃতি কেবল কিছু কালের জন্য অন্তরে থাকিয়া মানুষকে ভাল মন্দ, সুখ দুঃখের ফল ভোগ করায়।

পরিবর্ত্তনই কালের নিয়ম, কালের শাসনাধীন হইয়া এই মরজগতে কতই পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেই নিত্য নূতন, আজ যাহাকে যে ভাবে দেখি, কাল আর তাহাকে সে ভাবে

দেখিতে পাই না, জাগতিক নিয়মে তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যেন সেটী আর ঠিক সেটী নাই, অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর কালের অনন্ত গর্ভে মিশিয়া গেল। গত বৎসরের সমস্ত ঘটনাবলি মনোমধ্যে জাগরিত হইল, সেই অসহ্য ক্লেশ, দুর্ব্বিসহ শোক জ্বালা, স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া, মনকে বিষাদ সাগরে নিমগ করিতেছে। কিন্তু এই স্মৃতিই বা কদিন থাকিবে? নূতনের আবির্ভাবে পুরাতন সমস্ত যাইবে, কিছুই থাকিবে না।

বিগত বৎসরের শেষ ভাগে আলোচনা নানা বিভীষিকায় পতিত হইয়াছিল, তাহার ভাগ্যগগণ ঘোর ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ঘোর বিপত্তি বাত্যায় তাহার জীবনতরী একরূপ মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যিনি কাণ্ডারী হইয়া আলোচনাকে এই অকূল সংসার সাগরে ভাসাইয়াছিলেন, তিনিও মালবলীলা সম্বরণ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, দিন কতক আলোচনার আর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ইহার কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও অসাধ্য বোধে ইহার হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, সুতরাং সকলেই ভাবিয়াছিল বুঝি এ অনর্থপাতে তাহার অস্তিত্ব এ জগত হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু মা জগতজননীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এক্ষণে সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে, "বঙ্গভূমি" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বাবু গোরাচাঁদ দাস সন্তুষ্টচিত্তে ইহার পরিচালনের ভার লইয়াছেন। এবার হইতে "আলোচনা" ৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে নিয়মিতরূপে বাহির হইবে।

গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আলোচনা এই শুভ বৈশাখ মাসে চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। উপস্থিত বর্ষে আমরা ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব, এবং প্রতি মাসে একখানি করিয়া চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নবীন লেখকগণকে উৎসাহ দান করাই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা এই গুরুভার স্কন্ধে লইয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, এক্ষণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি।

প্রেম ও অশ্রু।

অই যে সুনীল আকাশ পটে, সুদূর অনন্তব্যাপী নীলাম্বরের কোলে শত শত, সহস্র সহস্র, কোটী কোটী জ্যোতির্ম্ময়ী তারা জগতের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে—অই যে ত্রিদিবের দেববালা কর্ত্তৃক জ্বালিত স্বর্ণ-দীপ-শ্রেণী নভোমণ্ডল মধ্যে এক অপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব, আভাময়, আনন্দদায়ক, মধুর, মৃদু, সরল ও স্নিগ্ধ আলোক রশ্মির মাধুর্য্যে প্রকৃতিকে সজ্জিত করিয়াছে—অই যে প্রভাময় স্বর্গীয় চক্ষুগুলি মানবের ছলনা, প্রতারণা, কপটতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সকলকে তুচ্ছ করিয়া যেন ঘৃণার হাসি হাসিতেছে, সময়ে অই হাসিরও অবসান আছে—ও মাধুর্য্যেরও বিলয় আছে—ও জ্যোতিরও হ্রসিমা আছে। অই যে চাঁদ হাসিতেছে, হাসিয়া আপন হাসিরাশিতে জগৎ মাতাইতেছে, ব্যথিতের ও পীড়িতের প্রাণে আশার ক্ষীণ রশ্মিক্ষেপন করিতেছে, সরোবরে কুমুদ কহ্লার ফুটাইতেছে, উহারও অই স্ফূর্ত্তির প্রশম আছে—হাসির নির্ব্বাণ আছে, বিপদের মুহূর্ত্ত আছে—আর আছে সেই সর্ব্বজয়ী, বিশ্বব্যাপী দুঃখ। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে চন্দ্রের আবার স্ফূর্ত্তির প্রশম, হাসির নির্ব্বাণ কি? বিপদের মুহূর্ত্ত কি? দুঃখ কি? উত্তরে আমরা বলিব অমানীশা নিশীথে চন্দ্রের অভাবেই কি তাহার স্ফূর্ত্তির প্রশম ও হাসির নির্ব্বাণ হয় না? রাহু গ্রাসের মুহূর্ত্ত কি তাহার বিপদের মুহূর্ত্ত নয়? জলদজাল তাহার প্রভা নাশ করিলে কি তাহার দুঃখের কারণ হয় না? এইরূপ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, নীচ হইতে মহৎ, তৃণ হইতে বিশাল তরুরাজী, বালুকণা হইতে মহান গিরি-শৃঙ্গ পর্য্যন্ত আপন আপন অবস্থার উন্নতি ও অবনতির নিয়তিতে আবদ্ধ। জগতের সকল পদার্থই অবস্থা বিষয়ে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে" কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদিগের এই জগৎও উক্ত প্রথার বহির্ভূত নহে। এক কালে—একযুগে—এই জগতই অনন্ত সুখের—অনন্ত শান্তির—অনন্ত প্রীতির আধার ছিল—এক সময়ে এই জগতই প্রেমে মাতোয়ারা ছিল। ভ্রাতৃভাবের বিমল উচ্ছ্বাসে এক দিন এই জগতে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তখন এখানে ছলনা ও চৌর্য্য

আপন আপন রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই—পাপের কলঙ্ক কালিমা মানব হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তখন জগৎ স্বর্গ ছিল—মানব দেবতা ছিল। সেই আমাদের সত্যযুগ। সত্যযুগ কতকাল হইল অতীতের পথে বিলীন হইয়াছে। তাহার পর ত্রেতা ও দ্বাপরে। ত্রেতা ও দ্বাপরও আমাদের বহুপূর্ব্বে বহুপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা কলি যুগ বা আইরণ এজের প্রজা।

জীব যখন যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থার অতীত, সে কিছু কল্পনা করিতেও পারে না; সুতরাং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে। মৎস্য বিক্রেতা মীন-গন্ধ অপেক্ষা সুরভি কুসুমবাস অধিক মধুর বলিয়া বোধ করে না, অধিকন্তু মীন গন্ধই তাহার নিকট অধিক আদরনীয়। রাখাল বালক সারাদিন রৌদ্রে গোপাল লইয়া বেড়ায়, ক্বচিৎ কখন ছায়া প্রাপ্ত হয়, কখনও বা ছায়ায় বসিবার অবসরও মিলে না। সে ভাবে আমি যদি রাজা হই, তাহা হইলে কেবল ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিব, আর ধামা ভরিয়া ভুজা খাইব। ছায়ায় বসা এবং ধামা ভরিয়া ভুজা খাওয়া অপেক্ষা অধিক কিছু সুখ বা শান্তির কল্পনা সে করিতেই পারে না।

আমরা কলিযুগের প্রজা। আমরা ছলনা, কপটতা, হিংসা, দ্বেষ, পাপ ও প্রলোভনের দাস; সুতরাং আমরা ইহাদেরই পাপাভিলাষ চরিতার্থকরণে সমুৎসুক। এই দাসত্বের ফলে আমাদের বাসনা-সাগর মথিত হইয়া গরল উৎপন্ন হয়। জীবনের মাঝে আমরা যে দুঃখ যাতনা, শোকসন্তাপ, জর-জ্বালা বেদনা ও পরিতাপ ভোগ করি, সেই সকলই হইতেছে আমাদের বাসনা *সাগরের গরল। এই গরল পানেই আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—প্রাণ* পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। আমরা এই বিষের দহনে নিরাশ হইয়া—ঝালাপালা হইয়া, যখন অশ্রুর আশ্রয় লই তখনই একটু শান্তি পাই; এই জ্বলনের মধ্যে আমরা যদি প্রেমামৃত লাভ করিতে পারি—প্রেমের চক্ষে জগৎকে দেখিতে পারি—প্রেমিক হইতে পারি, তবে এই দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার সম্ভাবনা, নচেৎ যে ব্যাথা সেই ব্যাথা—যে কষ্ট সেই কষ্ট রহিবে। প্রেম ও অশ্রু ভিন্ন জগতে সুখলাভ অসম্ভব—শান্তি লাভ অসম্ভব। যে প্রেম শিখে নাই সে পাষাণ—পাষণ্ড। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয় আবার একস্থানে লিখিয়াছিলেন, যে না কাঁদে সে শয়তানের দাস।

যে প্রেম আপনার পূত প্রবাহে ঘোর পাপী জগাই ও মাধাইয়ের পাপ-রাশি বিধৌত করিয়া,তাহাদের উভয়কে মাতোয়ারা করিয়াছিল—বিশ্বপ্রেমিক করিয়াছিল, যে প্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রেমোন্মত্ত দুই ভাই অশ্রুজলে ভাসিয়া, জগৎ সংসার আপন করিয়া সুখের—শান্তির অনন্ত সাগরে ভাবের তুফানে আত্মহারা হইত, সেই প্রেম, সেই অশ্রু যে না চিনিয়াছে—যে না বুঝিয়াছে—যে না আপন করিতে পারিয়াছে, তাহার জন্মই বিফলে কাটিয়া গেল। প্রেম ত এখনও শিখিলাম না। জগতের—সংসারের জ্বলন সহ্য করিয়া, কখনও প্রাণের সহিত—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্ফূর্ত্তির সহিত হাসিতে পারিয়াছি কি না জানিনা; কিন্তু স্মরণ আছে, অনেকবার কাঁদিয়াছি বটে। তাই কি ছাই প্রেমময়ের নিকট প্রাণ ভরিয়া কান্নার মত কান্না কাঁদিতে পারিলাম! প্রেমিক যেমন করিয়া কাঁদে—ভক্ত যেমন করিয়া কাঁদে—মুক্তি প্রার্থী যেমন কাঁদে, তেমন কান্না কি আমরা—পাপী আমরা—পিশাচ আমরা কাঁদিতে জানি? সে কান্না কাঁদিতে শিখিলে আজ আমাদের এ দশা হইবে কেন? ক্লেশের আধিক্যে যখন হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে—প্রাণে একটা বিষাদের ছায়া পড়ে, সেই সময়ে—সেই উচ্ছ্বাসে হৃদয় যে মর্ম্মযাতনা উদ্গীরণ করে, তাহাই বুঝি চক্ষে প্রবাহিত হইয়া অশ্রু নামে অভিহিত হয়। তাহাতেও কতক শান্তি আছে, সে অশ্রুতেও প্রাণের আগুণ যেন নির্ব্বাণোন্মুখ হয়; কিন্তু কই তাহা ত চিরতরে নির্ব্বাপিত হয় না! যদি আমরা কাঁদিতে জানিতাম—কাঁদিতে শিখিতাম, তাহা হইলে হয়ত নিভিত। যদি প্রেম শিখিতাম, সেই ভগবৎপদের প্রেমে পাগল হইতে পারিতাম, জগতকে প্রেমে মাতাইতে পারিতাম। আর নয়ন, কপোল ও কণ্ঠের ভূষণ করিতে পারিতাম—প্রেমাশ্রুকে; হইলে হয়ত প্রাণের জ্বালা জুড়াইত—শান্তি মিলিত! তাহা হইলে এই হাসি তাহা কান্নার মাঝে, এই সুখ দুঃখের শান্তি ও অশান্তির মাঝে, আমরা চিরানন্দময় হৃদয় লইয়া ভ্রমিতে পারিতাম।

ভগবৎ প্রেমে—বিশ্ব প্রেমে মাতোয়ারা হওয়াত দূরের কথা, ভগবানের নিকট ভক্তের মত কাঁদিতে শিক্ষা করা ও বহুপুণ্যের কথা; আমরা সংসারে ভ্রাতৃ প্রেম পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ নহি,তাই গৃহে গৃহে পৃথগন্নের ব্যবস্থা—তাই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—তাই প্রতি সংসারে পিশাচের অট্টহাসি ও

তাণ্ডব নৃত্য বিরাজিত।” এখন আর আমরা ভাইয়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া আনন্দে ভাই বলিতে বলিতে আত্মহারা হই কি? তাহা হইব কেন? এখন যে আমরা মানব-পরিচ্ছদাবৃত পিশাচ মাত্র। পিশাচে কি প্রেম জানে?—পিশাচের কি আবার ভাই আছে? আত্মীয় পরিজন আছে?

মৃণালিনী উপন্যাসে হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথোপকথনে স্বর্গীয় কবিবর বঙ্কিম চন্দ্র মহাশয় মনোরমার মুখ দিয়া প্রেম বুঝাইয়াছেন। মনোরমা যাহা বলিয়া প্রেম বুঝাইয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই,—ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন। মত্ত হস্তি সেই গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। গঙ্গা প্রেম প্রবাহিনী; ইহাতে যে অবগাহন করে, সেই পবিত্র হয়—ধন্য হয়। যে সকল ত্যাগ করিতে পারে—সর্ব্ব জয়া হয়, সেও প্রেমকে মস্তকে ধারণ করে। স্বয়ং মহাদেব প্রেমময়ী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। হস্তি দম্ভ অবতার-দম্ভ প্রেমের বেগ ধারণ বা গতিরোধ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রেমের প্রবাহে দম্ভ স্থির থাকিতে পারে না, তাই দম্ভরূপী হস্তি গঙ্গার প্রেম প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল।

হায়! আমরা এমনও প্রেম শিখিলাম না—কাঁদিতে শিখিলাম না। প্রেম শিখিব কি, এখনও আমরা প্রেমের সংজ্ঞা জানি না—প্রেম বুঝা বা প্রেমের পরিচয় পাওয়া ত দূরের কথা। আর কান্না? তাহাতেও বুঝি বিধি প্রতিবাদী। কয়েক খানি গাতি কাব্যে কান্নার স্রোত বহিয়াছিল ও বহিতেছিল। উন্নতি প্রয়াসী নূতন নূতন লেখকের লেখনী সকল ও অই স্রোতে তরঙ্গ তুলিতেছিলেন; কিন্তু সমালোচকের বিষদংশনে আহাও বুঝি ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। কোনও সমালোচক সেই সকল করুণরসোদ্দীপক কাব্য দেখিয়া কহেন, বড় একঘেয়ে লেখা; কেহ কেহ বলেন, এক জনকে একরূপ লিখিতে দেখিলে বর্ত্তমান সময়ের লেখক গণ অমনি সেইরূপ অনুকরণে লিখিতে চেষ্টা করেন, কোনও প্রভু আবার বলেন, বর্ত্তমান সময়ের লেখকগণের মধ্যে এক রোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই যে কাব্য লিখিতে হইতে কেবল এক কান্নার সুরে লিখিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। শেষোক্ত প্রকারের সমালোচক বোধ হয় চিকিৎসক হইবেন, নচেৎ লেখকের রোগ চিনিলেন কি প্রকারে? যাহা হউক, এই সকল সমালোচনার উত্তরে আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, হৃদয়ের

ভাব এবং উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা ও বুঝাইয়া দেওয়াই কবির কার্য্য। ইহার বিপরীত অর্থাৎ মনে যে ভাব উদয় না হয়, তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা কবির পক্ষে কুপথ এবং সেরূপ করিলেও তাঁহার লেখা কাব্য নামের উপযোগী হয় না। এখন বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যের সময়—দুর্গতির সময়। এখন কাব্য লিখিতে গেলে তদনুযায়ী ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় কি? এই দুঃখের সময় বিষাদের হৃদয় লইয়া, স্ফূর্ত্তির স্রোত বহাইতে গেলে—আনন্দের তরঙ্গ তুলিতে গেলে—কাব্য সমাজে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে তাহা চিন্তাশীল মহোদয়গণ অবশ্য বুঝিবেন। বঙ্গদর্শনে এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। সমালোচকগণ এই সকল কারণ না বুঝিয়াই লেখকগণকে আক্রমণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। তাই বলি—কাঁদিতে শিখিব কি প্রকারে—এরূপ পদে পদে বাধা পাইলে, কান্নার মত কান্না শিখিব কেমন করিয়া? এই সমালোচকের জ্বালায় জ্বলিয়াই বাইরণ বলিয়াছিলেন, কিছুই শিখি নাই। যদি প্রেম বুঝিতাম—কান্না শিখিতাম—অশ্রুর মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে কি আমাদের এই গতি হয়?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।
সাং কোন্নগর।

কবির অদৃষ্ট।

এজগতে, সকল জিনিষেরই একটু না একটু আদর আছে, যে যেমন, তার তেমন একটা উচিত মূল্য আছে, আবার তার রাখবারও একটা উপযুক্ত স্থান আছে;—কিন্তু হায় পোড়া সংসারে কবির তেমন আদর ত কৈ কখনই দেখিনা তারও কৈ তেমন একটা উচিত মূল্যও দেখিনা, কৈ উপযুক্ত না হয় একটা যা হক তা হক গোচের স্থান বা আদর তাও ত কৈ দেখিনা। তার ভাগ্যে চির বিষাদ, ঘোর অপবাদ, উপেক্ষা, লাঞ্ছনা, ঘৃণা বা বঞ্চনা, এইত তার একেবারে একচেটে; জন্ম মুহূর্ত্ত হইতেই যেন বিধাতা তাকে মার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে দারিদ্র্যের কোলে চিরকালের জন্য বসিয়ে দেয়, আর তাকে উঠতে দেয় না,

কত সময় হয় ত মাকে 'মা' বলে, বাপকে বাপ বলে ডাক্তেই দেয় না, তাকে যেন জগতের সকল রকম স্নেহ সুখে বঞ্চিত করে, দুঃখের অনন্ত পসরাটী তার মাথায় আস্তে আস্তে চাপিয়ে দেয়! তার আর দ্বিরুক্তি কর্বার যো থাকে না, চির কালের ক্রীতদাস যা, সেও তাই!

তার পর তাকে সংসারী সাজে সাজিয়ে পাপ সংসারে একবার যেমন তেমন করে ঢুকিয়ে দিয়ে, গাছে তুলে মই কেড়ে নেবার মতন, তফাৎ থেকে কেমন তার জীবন নাটকের সুখ দুঃখ প্রভৃতি এক একটী অঙ্কের রংদার অভিনয়, তার পর অভিনয় শেষ হতে না হতেই আবার তার উপযুক্ত প্রহসনের তর বেতর রং তামসা দেখবার জন্য কত ব্যস্ত হয়!

হায়! হায়! বেচারী তখন কি কর্বে বল? তার ত আর তখন কোন হাত নেই, সে তখন কলুর বলদ, ঘানিতে একবার জোড়া পড়েছে, আর যায় কোথা? এখন তাকে প্রভুর ইচ্ছা মতেই, বিষম বিপাক হইলেও প্রতিপাকে, চোকের জল চোখে মেরে, ঘাড়টী হেট করে ঘুরতেই হবে! তার তখন আর এক পাও দাঁড়াবার যো নেই,—থামলেই অমনি চাবুক!!

এইত এত দুঃখ, এত কষ্ট, তাতেই কি ছাই নিস্তার আছে! তার মনে সদাই শঙ্কা, সদাই সন্দেহ, সদাই কত ভাবনা! এক দণ্ডের জন্য শান্তি কাকে বলে, সংসারের সুখই বা কি, বেচারি তার আস্বাদন ত পেলেই না, ভাল করে সাদ মিটিয়ে আহার নিদ্রা ত দূরের কথা, মনের আবেগে কখনও যে স্থির হয়ে এক দণ্ডের তরে আপন মনে প্রাণ খুলে হেসে কেঁদে প্রাণ জুড়ুবে তারও যো নেই! দুঃখে দুঃখে সারা জন্মটা কেটে গেল, জন্মে অবধি একদিনের জন্য বাপ মার আদর বরাতে ঘটলো না, সুখ কেমন তা জান্লে না, খেলে খেলে বেড়াবে, আমোদ আহ্লাদ করবে তাও হল না, অর্থ-দাসের কেবল—অর্থ-চিন্তা আর অন্ন-চিন্তা! দুঃখীর ঘরে এসে, গোলামের দলে মিসে, গোলামের জাতের গোলামী আর ঘোচে না।

কাজেই পাঁচ দেবতার আশীর্ব্বাদে সাত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়িয়ে, যদি কখনও একটু ফুরসৎ পেলে, অন্য আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ দিয়ে যদি বা একটু মনের সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে মা স্বরস্বতীর আরাধনা কর্তে বস্লে, তার একটী স্তব, হ'ল বা একটী গঙ্গার বন্দনা কিম্বা একটী দাতাকর্ণ বা ঐ রকমের অন্য কোনও

করিবার জন্য রাজার অন্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা এখন কোন সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, জীবনশূন্য দেহকেই দগ্ধ করে। কিন্তু হৃদয়ে চিন্তার অনল জ্বলিয়া উঠিলে তাহা জীবিত দেহকেও দগ্ধ করিয়া থাকে। চিন্তার তুল্য শত্রু মানবের আর কিছুই নাই। পুষ্পে কীট প্রবেশ করিলে যেমন অচিরে সেই পুষ্পকে নষ্ট করে, চিন্তা কীট প্রবেশ করিলে মানব দেহকেও সেই রূপ জর্জ্জরিত করে। পাঠক! পূর্ব্বেও তোমরা সুশীলাকে দেখিয়াছিলে, আর আজ ঐ দেখ, দেখিলে চিনিতে পার কি? যেন এ মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নয়, যেন এ সুশীলা সে সুশীলা নয়। দেহের সে লাবণ্য নাই, মুখে সে মধুর হাস্য নাই, অঙ্গের সে সৌন্দর্য্য আর পরিলক্ষিত হয় না। যেন পূর্ণচন্দ্রকে রাহুতে গ্রাস করিয়াছে। পতিপ্রাণা সতী স্বামী বিরহে যে কিদৃশ মর্ম্মযাতনা অনুভব করে, এই সুশীলার দুর্দ্দশা দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে। কেবল মাত্র এই পঞ্চদশ দিবস ভীমসিংহের দর্শন না পাইয়া সুশীলার এই দশা, না জানি, আর কিছু অধিক দিন এ বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইলে, তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থাই হইবে। হায় ভগবান! কেন তুমি সুকোমল পুষ্পে কীটের আবাস-স্থল করিয়াছ, কেন তুমি সুখদ বসন্তের পর ভীষণ বর্ষার সৃষ্টি করিয়াছ, সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা রজনীর পর কেন দুরন্ত অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের ব্যবস্থা করিয়াছ, আর কেনই বা সুদীর্ঘ কাল মিলনের পর, প্রাণারামকারী প্রণয়ের পর বিষম বিরহের সৃষ্টি করিয়াছ। এ তোমার কি খেলা জগদীশ। জগতের পিতা হইয়া, সর্ব্বজীবের সুখদাতা হইয়া, এ তোমার কি লীলা খেলা দয়াময়। দেখ দেব! আজ তোমার সৃজিত একটী আদর্শ রমণী-রত্ন বুঝি বিচ্ছেদ হুতা-শনে প্রাণ হারায়, বুঝি প্রিয় বিচ্ছেদে তাহার জীবন যায়।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, বারি রাশির দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ হইতে পারে। কিন্তু বিশাল বারিধী মাঝে বাড়বাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, তাহাকে কিছুতেই নির্ব্বাণ করা যায় না। অন্তরে ক্রোধানল, কামানল প্রজ্জ্বলিত হইলে বরং ধৈর্য্যবারি সিঞ্চনে তাহা প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু বিচ্ছেদ হুতাশনে দগ্ধ হইলে, তাহার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। তবে যদি কখন সেই বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ, সেই প্রাণ-প্রিয়-বরকে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাণ

হইতে পারে, সে অনলে জলসেক হইতে পারে, নতুবা তাহার আর অন্য কোন ঔষধ নাই।

প্রাতঃকালে প্রায় সকল জীবের মনেই আনন্দ থাকে, প্রাণ কথঞ্চিৎ সুস্থ ভাব ধারণ করে, ইহা সার্ব্বজনীন স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু চিন্তায় যার হৃদয় জর জর, তার প্রাণে সুখ কোথা, তার শান্তি চিরতরে তিরোহিত হইয়াছে। সুশীলার প্রাণে তিল মাত্র আনন্দ নাই, আজ পঞ্চদশ দিবস হইল, তিনি আনন্দকে অন্তর হইতে বিদায় দিয়াছেন। রাজ্ঞী সুশীলার দিনও নাই, রাত্রিও নাই, সদাই সমভাব, সদাই করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, সেই এক ধ্যানে নিমগ্না, তাহার আর অন্য চিন্তা নাই, কেবল সেই পাদুখানি, যাহা তিনি জীবনের একমাত্র সম্বল বলিয়া মনে করেন, যে পাদুখানিকে তিনি এই দুস্তর ভবসাগরের একমাত্র তরণী বলিয়া জানেন, সুশীলার চিন্তা কেবল সেই সর্ব্বার্থ সার স্বামীর রাজীবচরণ, ইহা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পতিপদ ধ্যানে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, এই কয় দিবস তাহার অন্য কোন কার্য্যই নাই ; এই কয় দিন যেন তাঁহাতে তিনি নাই। জীবন শূন্য দেহের যে দশা, ভীমসিংহ শূন্য সুশীলার সেই দশা হইয়াছে। প্রত্যহ রাজ কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় মন্ত্রি আসিয়া যেমন রাজ্ঞীর অনুমতি গ্রহণ করেন, অদ্যও মন্ত্রী আসিয়া অভিবাদন করতঃ রাজ্ঞী সমীপে উপস্থিত হইলেন। সুশীলা বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয়কে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন—তাতঃ! অনুচরগণ কি ফিরিয়া আসিয়াছে? মন্ত্রি বলিলেন—মা! আজও কেহ প্রত্যাগমন করে নাই, তবে আর বিলম্ব নাই, শীঘ্রই আসিবে। জননী! আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন, মহারাণা শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই বলিয়া মন্ত্রি রাজ সভায় গমন করিলেন।

বেলা প্রায় মধ্যাহ্নের সমীপবর্ত্তী, বিবস্বান মধ্য গগনে উদয় হইয়া, প্রখর কিরণ জালে জগতকে দগ্ধ করিতেছেন, এ সময় বাটী হইতে বাহির হয়, এমন কাহার সাধ্য নাই। এই ভয়ানক সময়ে একজন অনুচর আসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রাজসভায় উপনীত হইল, এবং মন্ত্রী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া বলিল—মন্ত্রী মহাশয়! মহারাণা আগত প্রায়, অনুমান অদ্য সন্ধ্যার সময় রাজধানীতে পৌছিবেন। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী আহ্লাদে পুলকিত হইয়া

বলিলেন—রামদেব! তুমি একবার অন্তপুরে রাণী মার নিকট এই সংবাদ দিয়া আইস।

রামদেব মন্ত্রী মহাশয়ের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, অন্তপুরে সুশীলার নিকট সংবাদ প্রদান করিল।

পতি বিরহ-বিধুরা রাজ্ঞী সুশীলা পতির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, যে কিরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। রাজ্ঞী আনন্দে বিভোর হইয়া বার্ত্তাবহকে একছড়া সোণার হার পারিতোষিক দিলেন। বার্ত্তাবহ রামদেব। রাণী মাকে প্রণাম করতঃ নিজকার্য্যে প্রস্থান করিল।

বহু কষ্টে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যাসময়ে মহারাণা ভীমসিংহ স্বরাজ্যে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। রাজা আসিয়াছেন, শুনিয়া প্রজাবর্গের মধ্যে এক আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলেই মহারাণাকে দেখিতে আসিল। ভীমসিংহ সকলকেই যথাযোগ্য নমস্কার, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। পরে মন্ত্রীর সহিত বহুক্ষণ বাক্যালাপের পর সেদিন অন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। রজনী সমাগত হইল।

আতপ-তাপ-তাপিতা পিপাসিতা চাতকিনী জল দর্শনে যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, নব জলদের বারিধারা পানে তাহার যেমন নবজীবন লাভ হয়। সাধ্বীসতী সুশীলা পতির দর্শন পাইয়া তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিলেন!

মহারাণা ভীমসিংহ আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সুশীলার নিকট বলিতে লাগিলেন, শেষে সন্ন্যাসীর কৃপা ও তাঁহার বরে পুত্র-রত্ন লাভ হইবে, তৎসমস্তই বলিলেন, কেবল বোম্বাই রাজ চন্দ্রকেশরীর কন্যা পদ্মাবতী সংক্রান্ত কথাগুলি গোপন রাখিলেন।

সুশীলা নিজ প্রাণ পতি প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই আহ্লাদ সাগরে ভাসমানা হইলেন এবং বলিলেন প্রাণেশ্বর! এই পঞ্চ দশ দিন পর্য্যটনে ত কোনরূপ কষ্ট হয় নাই, কোথাও ত বিপদে পতিত হইতে হয় নাই? ভীমসিংহ মহাবিভ্রাটে পড়িলেন, এইবার বুঝি পদ্মাবতীর কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, ভাবিয়া তিনি কথঞ্চিৎ বিমনা হইয়া রহিলেন।

পরে উপর্য্যুপরি জিজ্ঞাসার পর ভীমসিংহ বাধ্য হইয়া, পদ্মাবতীর কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন আসিবার সময় তাঁহাকে বিবাহ

করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। মরি মরি! সতী স্ত্রীর অন্তকরণ কি সরলতাময়—সপত্নীর কথা শুনিয়া তাহার অন্তকরণে তিল মাত্র দুঃখের উদয় হইল না, বরং স্বামীকে বিপদে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া,তাহাদিগকে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন—মহারাজ! আপনি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন পদ্মাবতীকে আপনার বিবাহ করা উচিত, যখন তাঁহারা আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন,তখন তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ না করিলে প্রত্যব্যায় ভাগী হইতে হইবে। অতএব আমার অনুরোধ আপনি পদ্মাবতীকে গৃহে আনয়ন করুন, আমি তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নির ন্যায় যত্ন করিব। আমাদের মধ্যে কখনই সপত্নী বিদ্বেশানল প্রজ্জলিত হইবে না বরং সেই পতি-প্রাণ-রক্ষাকারিণা রমণী-রত্নের দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম—রাজন! আমি পদ্মাবতীর সরল স্বভাবের বিষয় বিলক্ষণ জানি, স্বামিন্! আমার অনুরোধ আপনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আমার মনবাসনা পুর্ণ করুন।

পাঠক।—এরূপ স্ত্রী কি আপনারা কখন দেখিয়াছেন, এ রমণী-রত্ন যে সংসার উজ্জ্বল করিতেছেন, তথায় কি শোক, দুঃখ স্থান পাইতে পারে, তাহা সদাই আনন্দময়, সদাই শান্তিময়। এখনকার স্ত্রীর সহিত কি সুশীলার চরিত্রের তুলনা হয়।

মহারাণা ভীমসিংহ সুশীলার এবম্বিধ জ্ঞানপুর্ণ, নিস্বার্থ-ভাব-পরিপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুশীলে! তুমি মানবী আকারে দেবী, তোমার মত গুণবতী প্রণয়িনী যাহার অঙ্কলক্ষ্মী, সে ধন্য, তার অনাহারে বনবাস ও মহাসুখকর। তোমার ন্যায় স্ত্রী লাভে পাপাত্মা ভীমসিংহ পবিত্র হইল। দেবি? তোমারই ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন দানে বহু দিনের আশা তৃপ্ত করিলেন। রাজবাটীও বহু দিনের পর শান্তিভাব ধারণ করিয়া রজনী যাপন করিতে লাগিল।

তুমি জান।

তুমি জান অন্তর্য্যামি,
কি ব্যথা হৃদয়ে মোর,
নীরবে আবেগ ভরে
কেন ঝরে আঁখি লোর!
তুমি জান, সন্ধিস্থলে
—পথহারা-লক্ষহীন—
ভাবিতেছি নিরন্তর
কোন্ পথে যাবে দিন!

তুমি জান, অলক্ষিতে
কত লো.ক বলে কত,
প্রলোভনে-পাপ-পথে
ফেলিতে সদাই রত;
সত্য-মিথ্যা তুমি জান,
সকলি তোমার জ্ঞাত!

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বালী।

সমায়িক প্রসঙ্গ।

বুয়রযুদ্ধ।—আজ নয় মাস অতীত হইল, ইংরাজ ও বুয়রে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। কিছুতেই এ যুদ্ধের অবসান হইতেছে না। কখন বুয়রের জয় হইতেছে, কখন বা শুনিতেছি ব্রিটীষ কেশরী অসভ্য বুয়রদিগকে পরাজিত করিয়া, বিজয় নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। আমরা ইংরাজের প্রজা, তাঁহাদের বিজয় লাভ হইলে, আমরা আনন্দানুভব করি, তাহাদের সুখে আমরা সুখী; কিন্তু এই যুদ্ধের যে শেষ কতদিনে হইবে, কতদিনে যে ইংরাজ জয় লাভ করিবেন এখন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তাহার উপর শুনিতেছি চীনের সহিত আবার সংগ্রাম বাধিয়াছে, সেখানে সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে, জানিনা এ যুদ্ধে আবার কত প্রাণী হত্যা হইবে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, বটে কিন্তু প্রজাগণ একে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণায় অস্থির, তাহার উপর যুদ্ধের জন্য মলামাল রপ্তানি, ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে যে আরও কি আছে কে বলিতে পারে। মা রণচণ্ডি। আর কতকাল এইরূপ যুদ্ধ সংঘর্ষে অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিবে।

এক্ষণে মা! আমাদের রাজা ইংরাজকে বিজয় লাভ করাইয়া, দেশে শান্তি স্থাপন কর, আমাদের রাজার প্রতি প্রসন্ন হও।

ধর্ম্মভবন।—বঙ্গবাসীর ধর্ম্মভবন নির্ম্মাণ কার্য্য এখন শেষ হয় নাই, শনৈঃ শনৈঃ চলিতেছে; এ কার্য্যে বঙ্গবাসীর সুযোগ্য ম্যানেজার বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, এই সৎ কার্য্যে কত প্রকার বাধা বিঘ্ন, বিপদ আপদ সহ্য করিয়াও বসুজ মহাশয় অটল অচল ভাবে ইহার কার্য্যে লাগিয়া আছেন? যোগেন বাবুর ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি যে একার্য্যে সফল মনোরথ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে সাধারণ হিতকর কার্য্যে সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়।

দূর্ভিক্ষ।—ভারতে দুর্ভিক্ষ বোধ হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে পরিণত হইল, আজ উপর্য্যুপরি ৫।৬ বৎসর ভারতবাসী দূর্ভিক্ষ দহনে দগ্ধীভূত হইতেছে, কতশত লোক আহারাভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে। অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ভারতভূমে অন্নকষ্ট, "সুবাসিত কুসুমে দুরন্ত কীট বাস" হা ভগবান! এ তোমার কি লীলা দয়াময়? অনুমান একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে দূর্ভিক্ষ কষ্ট কেহই জানিত না, সামান্য পর্ণ কুঠির হইতে রাজ প্রসাদ পর্য্যন্ত ধন ধান্য ও সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে সেই ভারতেই দূর্ভিক্ষের জন্য হাহকার, চারিদিকেই অন্নাভাবে লোক মারা যাইতেছে। রাজা অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণের রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, স্থানে স্থানে রিলিফ কার্য্য খুলিয়া প্রজাগণকে অন্নদান করিতেছেন। মহামতি লর্ড কার্জ্জন ইহার প্রতীকারের জন্য নিজের ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় প্রজারঞ্জনে যত্নবান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছেনা, সমস্তই যেন ভাসিয়া যাইতেছে। আমাদের মতে অন্য চেষ্টা না করিয়া, রপ্তানি কার্য্য কতক পরিমাণে কমাইলে বোধ হয় বিশেষ ফল দর্শাইতে পারে।

জামান দোকান।—সম্প্রতি কলিকাতা ১৫৬নং হ্যারিসন রোডে "ভট্টাচার্য্য ভকত কোম্পানী" নাম দিয়া একটী জামার দোকান হইয়াছে; আমরা এই দোকানে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দেখিয়াছি, বাজার অপেক্ষা দ্রব্যাদি ভাল, মূল্যও সুলভ, সকল প্রকার দ্রব্যই ইহারা সরবরাহ করেন, আমরা সাধারণকে একবার এই দোকানে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

নরবলি।—মানুষে স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিতে পারে না এমন কার্য্যই নাই। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ হইতে একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ সংবাদ আসিয়াছে। ঐ নগরে এক বণিকের একটী তুলার কল ছিল, কলটী কিছুদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া বন্ধ থাকে, এ জন্য সওদাগর মহাশয় কলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নরবলি দিবার মনস্থ করেন এবং তাঁহার দ্বারবানদিগকে হুকুম দেন যে সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইবে তাহাকেই ধরিয়া আনিবে। ভৃত্যগণ অনেক অনুসন্ধানের পর গোবিন্দ নামে একটী হিন্দু যুবকের দর্শন পায় এবং প্রভুর অনুমতি অনুসারে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কলের ভিতর জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে ফেলিয়া দেয়। যুবক বলিষ্ঠ ছিল, সে নিজের প্রভূত বলের সহিত অৰ্দ্ধ দগ্ধ শরীরে পিশাচগণের হস্ত অতিক্রম করিয়া পলাইয়া আসে, কাজেই দুরাত্মাগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। শুনিতেছি গোবিন্দ এখন হাঁসপাতালে। ভগবান তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য করুন। হায়দ্রাবাদ গভর্ণমেণ্টের এ বিষয় বিশেষ তদন্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দক্ষিণ বেটারা হরিসভা।—বিগত শনিবার দক্ষিণ বেটরা হরিসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শনিবার হইতে রবিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অষ্টমপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন, পরে সদলবলে মহাপ্রভুর নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। ঐ দিবস সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "হরিনাম মাহাত্ম্য" ও সভা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত হইলে দলে দলে হরিনাম সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া সুধামাখা নাম সংকীর্ত্তন করিয়া গ্রামবাসী ভক্তমণ্ডলীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় হইয়া সভাভঙ্গ হয়। বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র কুণ্ডুর মহাশয়ের যত্নে সভার বিশেষ উৎকর্ষসাধন হইয়াছে, এ জন্য তাহারা সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

(১) বঙ্গবাসী, (২) এডুকেশন গেজেট, (৩) হিন্দুরঞ্জিকা, (৪) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, (৫) সাহিত্য সংহিতা, (৬) প্রয়াস, (৭) মুকুল, (৮) সাবিত্রী, (৯) দারোগার দপ্তর, (১০) পুণ্য, (১১) ঋষি, (১২) বীরভূমি, (১৩) মাসিক, (১৪) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, (১৫) বঙ্গভূমি, (১৬) বীনাপাণী।

সাহিত্য সংহিতা। আমরা এই মাসিক পত্রিকার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে সাহিত্য সভা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম, এ বি এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য সংহিতার কার্য্যভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সম্পাদক ও একজন সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত পণ্ডিত, এক্ষণে পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবি হইলে, আমরা সুখী হইব। পত্রিকা খানির প্রবন্ধ নির্ব্বাচণ ও লিপি চাতুর্য্য সমস্তই বেশ হইতেছে। কাগজ ও ছাপা ভাল।

অঞ্জলী। ইহা একখানি কবিতা পুস্তক, যশাই সাহিত্য সমিতি হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তি প্রণীত; পুস্তক খানির অনেক গুলি কবিতার স্থানে স্থানে আমাদিগকে ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকারের কবিতা রচনার বেশ শক্তি আছে।

মাল ও অশ্রু মালা। এ দুই খানিও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত কবিতা পুস্তক মুল্য ।৵০ আনা, ইহার অনেক স্থলে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা গ্রন্থকারের উন্নতি কামনা করি।

ছায়া। মাসিকপত্র, আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা উপহার পাইয়াছি; অনেক কৃতবিদ্য লেখকগণ ইহাতে লিখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাপ্ত কয়েক সংখ্যার লেখাও মন্দ হয় নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। কাগজ ও ছাপা ভাল। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

সংস্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্রে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে রক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, সে দিনের মত অবসর লইবার জন্য পবনযানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। পক্ষীগণ কলরব করিয়া নিজ নিজ কুলায় আগমন করিতেছে। কৃষকগণ দিবসের পরিশ্রম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। সমস্ত দিবস বিচরণ করিয়া গাভীগণ হাম্বারবে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। গৃহস্থের গৃহিণী সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, সাঁজের বাতি জ্বালিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে! দেবালয়ে ক্রমে ক্রমে আরতীর শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাদিত্র সকল বাজিয়া উঠিতেছে। ভগবদ্ভক্ত শিরোমণী মহাশয়ের দেবমন্দিরে আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, পূর্ণানন্দের কালিকার মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যার সময়েই প্রতিবাসী স্ত্রীলোক সকল আরতি দেখিতে আসিয়া থাকেন, আজও দলে দলে লোক সমাগম হইতে লাগিল। শিরোমণী মহাশয় সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া মায়ের আরতি করিতে লাগিলেন। ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল প্রভৃতির গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতে লাগিল। ক্রমে আরতি শেষ হইয়া গেল; সকলে দেবীর পদে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে

প্রস্থান করিল! পূর্ণানন্দ ও তাহার প্রিয়পুত্র রমেশ সায়ংকালীন সন্ধ্যা কর্ম্মাদি সমাপন করিয়া আহারান্তে উভয়ে বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণের উপদেশ, অতি চমৎকার, তাঁহারা যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই আমাদের এতাদৃশ দুর্গতী হইতেছে। আর্য্য শাস্ত্রকারগণের উপদেশ, তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থা যে হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের মূলাধার, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অন্য বিধির ত কথাই নাই, আমাদের পণ্ডিত প্রবর চাণক্য যে সকল নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলেও সংসারে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, অনেক সময়ে তাহা দ্বারা আমাদের মহোপকার সাধন হইতে পারে!

তিনি বলিয়াছেন—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষ্যাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, প্রাপ্তেতু ষোড়ষবর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ।" ইহা কি ঠিক নয়, পুত্র বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা কি উচিত নয়, বৃদ্ধকালে পুত্রইত পিতার একমাত্র বন্ধু, যে কার্য্যেই হউক, পিতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিলে তাহা হইতে সুফলের আশা করা যায়; কিন্তু অধুনা এই কলিকালে কয়জন পুত্রের পিতার সহিত সদ্ভাব আছে; কয় জনই বা পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করে, আজকাল অনেক পিতাপুত্রে দিনান্তে সাক্ষাৎ হয় কিনা সন্দেহ, তা পরামর্শ ত পরের কথা। আর আজকাল সেরূপ গুণবান পুত্রও অতি বিরল! যে পুত্রের দ্বারা বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, যে সৎপুত্র একটী বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে, চৌদ্দপুরুষ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এখন সেরূপ পুত্র কয়টী জন্ম গ্রহণ করে। চরিত্রবান সৎপুত্রই বংশের অলঙ্কার এবং সেই পুত্রের সহিতই পিতামাতার সদ্ভাব থাকে। পাঠক! ঐ দেখ শিরোমণী ও রমেশ উভয়ে বসিয়া কেমন কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, পিতাপুত্রের এরূপ সদ্ভাব কি বাঞ্ছনীয় নয়! শিরোমণী মহাশয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রমেশ! তুমি সকল কথা শুনিয়াছ, এক্ষণে তোমার মত জিজ্ঞাসা না করিয়া কেন কার্য্য করিতে পারি না—ইহাতে তোমাব মত কি বাপ?

রমেশ পিতার বাক্যে অনুমোদন করিয়া বলিলেন—"বাবা! ইহাতে আমার কোনরূপ অমত নাই, তাহার কারণ আমাদের কিছুরই অভাব নাই,

ভগবান আমাদের সকল অভাবই মোচন করিয়াছেন, কেবল আত্মীয় স্বজনেরই একমাত্র অভাব। এক্ষণে যাহাতে ঐ অভাব পূরণ হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য, আর আমি নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিশেষরূপে জানি, তিনি গুণী, জ্ঞানী এবং অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক, তাহার কন্যা যে আমার জননীর উপযুক্তা হইবেন, তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি। অনেকেই বলে সৎমা কখনই মায়ের মত হয় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সদ্বংশের মেয়ে হইলে কখনই তাহার মন্দ ব্যবহার হয় না। আপনি যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত, যদিও আমাদের দাস দাসীর অভাব নাই, তথাপি আপনার লোকের নিতান্তই অভাব, এ অবস্থায় আপনার এ কার্য্য কখনই নিন্দনীয় নহে, আপনি মত না করিলেও, আমি এক দিন না এক দিন আপনাকে এ কথা বলিতাম।

শিরোমণী মহাশয় নিজ পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া সুখী হইলেন এবং বলিলেন—রমেশ! তোমার ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করিয়া, আমার আর কোন বিষয়ের ভাবনা নাই, আমি আবর্ত্তমানে তোমার দ্বারা যে আমার এবং আমাদের এই বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে, তাহাতে আর কোন রূপ সন্দেহ নাই, তবে যে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিতেছি, সে কেবল এই সমস্ত বজায় রাখিবার জন্য। যদিও আমাদের সংসার অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ছাত্রগণও আগত অভ্যাগত ব্যক্তির জন্য আমাদের সংসার একটী ভয়ানক পরিবার হইয়াছে, তাহাতে বৌমা একাকী কি করিবেন, এই জন্যই এই বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কার্য্য করিলে নরেশ্বর ও তাহার ভগ্নিকে কাজকর্ম্মের সময় পাওয়া যাইবে, এবং এই কার্য্য করিলে তাহাদের প্রভূত উপকারও হয়, তাহারাও অতি দরিদ্র, কন্যাটীকেও পাত্রস্থ করিয়া দায়োদ্ধার হইতে পারে।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া রমেশ পিতার নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"পিতঃ! আমি সমস্তই জানি, এ কার্য্য করিলে আমাদের পুণ্য বই পাপ হইবে না, ইহাতে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। এই বলিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন! পূর্ণানন্দও আনন্দের সহিত শয়ন করিতে গেলেন।

শিরোমণী মহাশয় আপনার অনিষ্ট করিয়াও পরের উপকার করিতে পারিলে, পরের দায়োদ্ধার করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। ইহাই

তাহার স্বভাব সিদ্ধগুণ ছিল। নরেশ্বর কন্যাদায়ে অতিশয় মনকষ্ট ভোগ করিতেছেন, এ বিবাহে শিরোমণী মহাশয় মনোযোগ না করিলে, নরেশ্বরকে নিশ্চয়ই জাতিচ্যুত হইতে হইবে। কারণ শিরোমণী তাহার স্বঘর! তিনি এই দায়ে দরিদ্র নরেশ্বরকে রক্ষা না করিলে আর কে করিবে! এই জন্য পূর্ণানন্দ এত উৎসুক হইয়া, এই বিবাহের জন্য আপন উপযুক্ত পুত্র রমেশের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

পাঠক! এ বিবাহের কথা ভাল লাগিতেছে কি? এ বিবাহে কি আমাদের মত আপনাদের মনস্তুষ্টি হইয়াছে। আজি এ সভ্য সমাজে আপনাদের ন্যায় সুসভ্যের নিকট এ কথা যে ভাল লাগিবে, তাহা ত বোধ হয় না। তবে রুচি অনুসারে সকলি ভাল লাগা সম্ভব,আর সেই জন্যেই আমাদের এই গল্পের অবতারণা

উপহার।

দু'দিনের হাসি-রাশি দু'দিনে ফুরা'য়ে যায়,
দু'দিনের রুচি ফুলে দু'দিন সুবাস রয়,
দু'দিনের প্রেমে পড়ে, বিরহ-গরল-রাশি,
দু'দিনে প্রেমিক-মুখে ফুরায় মধুর হাসি;
দু'দিনের তরে আসি' এই দু'দিনের দেশে,
যশের মুকুট শিরে কেমনে পরিলে হেসে?
দু'দিন জগতে আসি' সাধিয়াছ এত কাজ!
দু'দিনে শ্রীঅঙ্গে তব পরিয়াছ এত সাজ!
জগত-জনতা ভেদি' বসি' কীর্ত্তি নদী-তটে,
আছে কি সে বাল্য-স্মৃতি, হে সখা! হৃদয়-পটে?
হে সখা! হে প্রিয়তম! হে সুখ-শৈশব-সাথি!
হৃদয়ে কি জাগে তব সে আনন্দ-প্রেম-ভাতি?—
যদি জাগে, কবি ভ্রাতা! লহ এই উপহার;—
পরাণের ভালবাসা—আনন্দের নেত্রাসার!

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

ফুলের সাজি।

'বউদি' আমার।

(শ্রীমতী গিরিবালা দাসীর উদ্দেশে রচিত)।

১

কুমুদিনী বউদি' আমার,
আকাশের আমি শশধর ;
দূর হ'তে বউদির পানে,
চেয়ে থাকি তাই নিরন্তর।

২

বসুমতী বউদিদি মোর।
বরিষার আমি মেঘরাশি ;
বউদির চরণেতে তাই,
আঁখি জল ঢালি দিবানিশি।

৩

নব বধূ বউদি' আমার,
আসি 'বউ-কথা-কও'-পাখী ;
অহরহ শ্রবণেতে তার,
তাই বলি,—'কথা কও, সখি !'

৪

বউদিদি রজতের মল,
আমি তায় চিকণ ঘুঙ্গুর ;
বউদির প্রতি পদক্ষেপে,
বেজে উঠি তাই সুমধুর।

৫

বউদিদি মধুর আকর,
মাছি আমি আকুল তৃষায় ;
বউদির পরশনে তাই,
জড়াইয়া থাকি পায় পায়।

৬

বউদিদি 'বড়' মাখনের,
মিষ্টপ্রিয় আমি দীনজন ;
খপ্ ক'রে গিলে ফেলি পাছে,
দূরে তাই ফেরে অনুক্ষণ।

৭

বউদিদি সুপক্ক শ্রীফল,
হীন আমি শ্যামল বায়স ;
প্রাণ জ্বলে তবু তারে হায় !
পারি নাক করিতে পরশ।

৮

বউদিদি কমলা আমার,
আলো সে যে আঁধার ঘরের ;
পাইয়াছি তার সম সখি,
পুণ্য ফলে কত জনমের।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

শ্মশান বা শান্তি-নিকেতন।

(বাল্য-রচনা)

(পূর্ব্বাংশ)

শারীরিক পরিশ্রম করিবার পর,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আমি গেলাম সত্বর-
সুস্নিগ্ধ-অনিলবাহি-ভাগীরথী তীরে,
বসিলাম ক্ষণকাল কাতর-অন্তরে।
কথঞ্চিৎ ক্লান্তিদূর হইবার পর,
প্রলোভিত হইলাম হেরিতে সন্ধ্যার-
মুরতি, অপূর্ব্বরূপ হেরিয়া তাহার,
উৎফুল্ল হইল মন আনন্দে অপার।
চঞ্চল নয়ন সদা ছুটিছে চৌদিকে,
অস্থির চপলা প্রায় ধরে যাকে তাকে।
ধরিয়া ফেলিল এক অপরূপ শোভা,
বর্ণনা অতীত হয় সেই মনোলোভা।
নহে এই মনোলোভা সুন্দরীর শোভা,
পাগল করিতে পারে যাহাদের আভা।
ইহা হয় প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি,
মনুষ্যের জীবদ্দশা অন্তিমের গতি।
শুনিনু শ্মশান মাঝে কে বলিছে মোরে,
বুঝাতেছে উপদেশে আনন্দবিভোরে,
'কেন বাছা হওভীত দেখিয়া মায়েরে
কতবার দেখেছিলে ভুলেছ অন্তরে?'
তখন মোহিত আছি হেরিয়া তাণ্ডব,
অট্ট অট্ট হাসে যেন এইসব শব।
ক্যাকামেকা করিতেছে ভীষণ আরাব;
ত্রাসিত করি'ছে মোরে নব নব ভাব।
পোড়াকাষ্ঠ ছিন্ন বস্ত্র রজ্জু ও কলসী,
প্রতিবিম্ব ধরিয়াছে জাহ্নবী আরসি।

রহেছে পড়িয়া হোতা এক মৃতদেহ,
বাক্যহীন, স্পন্দহীন, জ্ঞানহীন তার
নিস্পন্দ চক্ষুর পাতা পড়েনাক আর।
বিবর্ণ হয়েছে তার সে মুখের শোভা,
কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা ছিল মনোলোভা।
একবস্ত্র পরে আছে তাহাও মলিন,
হইয়া পাষাণ সম অতীব কঠিন
কাড়িয়া রেখছে তার বসন-ভূষণ
স্বার্থপর মানবের স্বার্থই প্রধান;
স্বার্থশূন্য হ'লে তার মরণ সমান,
স্বার্থই জগত মাঝে ভাবে সে প্রধান,
স্বার্থপূর্ণ ভাবে ভাবে জীবন মরণ;
নিঃস্বার্থ ভাবের এই দৃষ্টান্ত শ্মশান।

* * * *

* * * *

'ভুলিনারে কাহাকেও আমি জগন্মাতা
মাতা হয়ে পুত্র-ভুলে আশ্চার্য্য এ কথা।'
পুত্রগণ মোর সব উন্মত্ত খেলায়,
খেলা ভাঙ্গিবার মোর নাহি সাধ যায়।
উদ্রিক্ত হইলে তার ক্ষুধার সময়,
খেলা শেষ করিবেক যবে স্বইচ্ছায়,
যখন আমার কথা উঠিবে মনেতে,
তৃষ্ণায় যখন তার বুক যাবে ফেটে,
আসিবেক 'মা' 'মা' বলি ছুটিয়া কাছেতে,
সে সময় আমি তার আসিব পাশেতে,

আয় যাদু আয় বলি কোলেতে লইয়া,
ক্ষুধা বুঝি উপযুক্ত দিব খাওইয়া।'
আহা, আহা, আহা আমি বুঝেচি এবার,
শ্মশান শ্মশান নয় আনন্দ-আগার।
ধন, মান, সুখ, আশা ত্যজিবে যে দিন
জগত জননী কোলে উঠিবে সেদিন।
ছাড়িয়া ভবের সুখ শিব যোগীবর,
ছাড়িয়া ভবের মায়া থাকে নিরন্তর,
জগতের সর্ব্বস্থান বারি পর্য্যটন,
সার বস্তু ভাবিয়াছে তোমারে শ্মশান।
সেই হেতু সদাশিব চাহে না কাহারে,
চাহে না ভবের সুখ আশ্রয়ি তোমারে!
কিসের অভাব ওহে শিব বিশ্বেশ্বর
কিসের অভাব হেতু পরনাক আর
সুন্দর সুন্দর আহা, বসন-ভূষণ,
হীরক-মুকুতা আর কাঞ্চন রতন,
কি হেতু ছাড়িলে তুমি এসব বিভব,
অভাব ভাব কি তুমি থাকিতে ওসব!
এ বিশ্বের নাথ হয়ে হও দিগম্বর,
জুটে নাকি একখণ্ড পড়িতে অম্বর?
অগরু চন্দন ছেড়ে মাখিয়াছ ছাই,
শ্মশানের শ্রেষ্ঠবস্তু, মাখিয়াছ তাই?
সন্তানক শত শত আদি পারিজাত,
পরিতে বিমুখ তুমি কেন ওহে নাথ?
'অর্ক-পুষ্প মালা আর ধুস্তুর প্রসূনে
শোভিত করেছ বক্ষ, পরেছ শ্রবণে!
শ্মশানের শ্রেষ্ঠফুল এই দুই হয়
তাই পরিয়াছ নাথ? বল না আমায়?
শ্মশানের সহ করে বন্ধুত্বস্থাপন,
ছেড়েছ কি ভোগবস্তু তাই পঞ্চানন?
আমার,আমিত্ব লোপ হয় এইখানে,
বৈরাগ্য সৌন্দর্য্য দেখ মোহের কাননে।
শিবের শ্মশান প্রীতি হেরিয়া নয়নে,
ছেড়েছেন রাজ সুখ প্রফুল্লিত মনে,
ধরেছেন মা আমার উলাঙ্গিনী বেশ,
দেখাইছেন জগতে শেষের যে বেশ।
অবোধ সন্তানগণে বুঝবার তরে,
সাজায়ে শিবেরে শব দাঁড়ায়ে উপরে,
অট্ট অট্ট হেসে বলে অবোধ সন্তান
পৃথিবীর মাঝে এই শ্রেষ্ঠতম স্থান।
বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হয়োনাক নর,
গর্ব্বখর্ব্বকারী এই শ্মশান তোমার।
আশীর্ব্বাদ কর মাগো ও শিব সুন্দরী
পাই যেন হেরিবারে শ্মশান-মাধুরী।
শ্মশান :-যে সূত্রে বেঁধেছ তুমি শঙ্করী মায়েরে
যে সূত্রে বাঁধিয়া তুমি রেখেছ শিবেরে,
বাঁধ মোরে সেই ডোরে সুদৃঢ় করিয়া,
যেন না পালাই কোথা ওডোর ছিঁড়িয়া।
যে ভাব দেখায়ে তুমি ভাবায়েছ শিবে
আমারে মোহিত কর তুমি সেই ভাবে।
তুষিতেছে তোমা' শিব প্রফুল্ল অন্তরে,
অসীম করুণাময় ব্রহ্ম পাইবারে।
আশ্রয় তোমার আমি লইলে জীবিতে,
রক্ষাকরো সে সময় ষড়রিপু হতে।
আশীর্ব্বাদ হেতু তব সদা যেন পারি,
রাখিতে মানস মত্তে তাঁহারি উপরি.
যিনি হন এ বিশ্বের এক অধীশ্বর,
যিনি হয়েন বাক্যের মনের অগোচর,
যিনি হন সদা সবে সমভাবে প্রীত
যিনি হন বেদের তন্ত্রের (ও) অতীত
যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্ট সসাগরা ধরা
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আর আকাশের তারা
ত্রিভুবন অতীত যিনি দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
যাঁহার মহিমা হয় অনন্ত অক্ষয়,
যাঁহার আদেশে ঘুরে জ্যোতিকমণ্ডলী
যোগীগণ যাঁরে ধ্যানে হয় কুতূহল
সনকাদি যাঁরে ভেবে সংসার ত্যজেছে
বেদান্ত যাঁহার কাছে বালক সেজেছে
বৃহৎ হইতে যিনি হন বৃহত্তম
যিনি হন ক্ষুদ্র হতে অতি ক্ষুদ্রতম
চিদাকাশে যিনি হন সদা প্রকাশিত
তত্ত্বের অতীত যিনি প্রেমময় খ্যাত
সদা যিনি সপ্রকাশে হন একাক্ষর
মতি যেন থাকে সদা চরণে তাঁহার।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাপস কুমার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বরাজ্যে প্রত্যাগম।

ভীমসিংহ পদ্মার নিকট বিদায় লইয়া ক্রমশঃ স্বরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার কালীন রাজকন্যা পদ্মাবতীর সেই ছল ছল নয়ন, সেই বিশুষ্ক মলিন মুখ-কমল, যখনই ভীমসিংহের অন্তরে উদয় হইতেছে, তখনই যেন মহারণার মন দুঃখে অধীর হইতেছে। চরণ আর চলে না, স্বরাজ্যাভিমুখে আসিতে তাহার পদ যেন আর উঠিতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে যেন পুনরায় ফিরিয়া গিয়া, সেই মুখ খানি, সেই দুঃখ-বিষাদ-বিজড়িত, নয়ন-জলে-প্লাবিত মুখ খানি আর একবার দেখিয়া আসি। এদিকে প্রাণ প্রতীমা সুশীলার জন্তও প্রাণ কাঁদিতেছে, অনেক দিন হইল সে সাধ্বী সতি পতিপ্রাণা সুশীলার বদন সরোজ না দেখিয়াও মন প্রাণ অস্থির হইয়াছে, কাজেই রাজপুতনাভিমুখে ফিরিতে হইল, মনে করিলেন রাজ্যে ফিরিয়া সুশীলার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া, তাহাকে স্বীকাব করতঃ পদ্মাকে লইয়া যাইতে লোক পাঠাইব। সুশীলার ন্যায় পতিব্রতা কখনই এ বিষয়ে অমত করিবেন না, আর রাজা হইয়াও ত একাধীক বিবাহ করিতে পারে, তবে আর চিন্তা কি জন্য, এই বলিয়া আশায় হৃদয় বাঁধিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজ্য রাজা শূন্য হইলে তাহার অনেক গোলযোগ ঘটে, অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে মহারাণা ভীমসিংহের রাজত্বে নানা প্রকার অনিয়ম, অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে বৃদ্ধ মন্ত্রির বহুদর্শিতা ও সুশাসনগুণে কেহ কোন রূপ অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে নাই। মন্ত্রি অনাহারে অনিদ্রায় অবিরত পরিশ্রম করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। যেখানে কোনরূপ অশান্তি কথা শুনিতেছেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় স্বয়ং যাইয়া, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এদিকে রাণীমাকে সান্ত্বনা

কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করলে, তো অম্নি কোথা থেকে যত বিপদ, যত ব্যাঘাত এসে যুট্‌তে লাগলো; জর জাড়ি. শরীরের গোলমাল, মনের অসুখ ত আছেই, এ সব কাটিয়েও যদি বাজারে বেরুল, তাতার উপর চারিদিক থেকে অম্নি কত নামজাদা বিদ্যাদিগ্‌গজের বড় বড় লম্ব। চওড়া সমালোচনা, কত রংচঙে, চট্‌ক-দার টিটকিরি বেরুতে লাগলো, কার ভাগ্যে বা অনেক কেলে পোড়ো বাড়ীতে শিব দ্যুতের কাজ আরম্ভ হলো, আর যার বরাত একটু ভাল, তার পক্ষে আর কিছু না হ'ক্ ছাঁদলাতলায় স্ত্রী আচারের ব্যবস্থার বরাদ্দ হলো!

বেচারির আর মুখটী তোলবার যো রইল না; যেন সমাজের চক্ষে সে কত অকর্ম্ম করেছে,—যেন জগতের কাছে সে কত অপরাধে অপরাধী! তার আর দোরের বার হবার যো নাই—সে যেন পলাতক বা ফেরারের আসামী; কাজেই তার লেখা জোঁখা বাইরে বেরিয়ে দশজনের আদর পাওয়া দূরে থাক, সে প্রথম চেষ্টাতেই হতাশে, আপশোষে, ঘৃণায়, লজ্জায় একেবারে বুক ভেঙে, মনে মরা হয়ে, প্রাণে মরা প্রাণ নিয়ে, দোর, জানালা বন্ধ করে অন্ধকূপের কয়েদীর মতন, গোপনে একটী ঘরে একা বসে থাকে, একটী কথা কবার সঙ্গীও জুটেনা, যে দুদণ্ড মনের কথা কয়ে পাথর চাপা বুকটাকে একটু হাল্কি করে!

তখন সরানি গঙ্গার ঢেউ এর মতন, বেচারির মনের দুঃখ মনেই উঠে আবার মনেই মিলিয়ে যায়;—বাছা আপন মনে কত ভাবে কত কাঁদে! যার দুঃখ, সেই জানে, যার যেখানে ব্যথা তার সেই খানে হাত, বাছার বুকের ভিতর সদাই ফল্গুনদী অন্তঃসিলা বইতে থাকে, বাইরের লোকে তার কি জানবে বল?

তার পর অনেক কষ্টে ভগবানের কৃপায় মেজাজটা একটু খানি ঠিক হতে না হতেই, তার উপর বিধাতা হয় ত আবার একেবারেই কপাল ভেঙ্গে দিলেন! দুঃখের উপর দুঃখ, এত জগতের কারকলেই চলে আসছে,—একে রামচন্দ্র সীতার শোকে পাগল, কতকষ্টে, কতযত্নে, কত ফিকিরে সীতার সন্ধান পেলেন, প্রাণান্ত পণে প্রিয়ার উদ্ধার করবার জন্য গাছ পাথরে সাগরে সেতু বাঁধলেন, কত আশায় বুক পাঁচ হাত!

ওদিকে ভগবান বল্লেন, "রস,"—মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো, সুখের সাথী, দুখের দুখী, ব্যথার ব্যথী ভাই লক্ষ্মণ শক্তিশেলে শুলেন! তখন রামচন্দ্র যেমন নিজের জীবনেও হতাশ হলেন, কত হা হুতাশ করতে লাগলেন!!

কবিরও তেমনি একটা বিপদের হাত এড়াতে না এড়াতেই তার চেয়ে ভয়ানক আর একটা বিপদ এসে উপস্থিত হয়! আজ হয় ত পিতার কাল, কাল মাতার মৃত্যু, পরশু ভাই ক্রমে ভগ্নী, তারপর বন্ধু পরে স্ত্রী বিয়োগ প্রভৃতি একটা না একটা ব্যাঘাত লেগেই আছে, বেচারির আর তিষ্টবার যো নাই; সদাই যেন মলেই বাঁচি ভাব; কখন বিধাতাকে গাল দেয়, কখন বা আপনার অদৃষ্টকে দোষে, আবার কখনও বা আত্মঘাতী হতেও ইচ্ছে যায়!—বাছার মনে তখন সদাই তুষের আগুন দিন রাত্রি হু হু করে জ্বলতে থাকে; পাগলা-গারদের পাগল আর কি করবে? গারদে মনটা একটু স্থির করবার জন্য পিতৃ-বিলাপ, মাতৃ-বিলাপ, ভ্রাতৃ-বিলাপ, বন্ধু-বিলাপ, কখনবা পত্নি-বিলাপ লিখতে সুরু করলে,—আপনি লেখে আপনি পড়ে, আপনি কাটে আপনি ছেঁড়ে, মন আর উঠে না, আর ছাই উঠবেইবা কি। তখন মনে ত আর মন নেই, কাজেই সেসব লেখাও আর হঠাৎ বাইরে বার করতে সাহস হয় না,—যদি বা কোন গতিকে একটু আধটু বেরুল, তো অমি তার উপর, সমালোচকের দল ময়রার দোকানের মাছির মতন ভন ভন্ করে, এগলি ওগলি বেড়াচ্চে,—তাদের নজর পড়লো, তারাত আর কবির মনের দুঃখ, প্রাণের ব্যাথা, বুকের শোক তাপ বুঝে না, তাদের চোখ ও বাঁকা, দৃষ্টিও বাঁকা, তারা কেবল মিষ্টির স্বাদটা চিনে ভাল, তাদের কাছে এ দুনিয়ার তেত একঘেয়ে কান্না হাষ্টি ভাল লাগবে কেন?

হায়! হায়! এই সাক্ষাৎ রুচি-অবতার পোড়া সমালোচকদের কিছুই অরুচি হয় না? হতভাগারা যেন ষষ্ঠী মার্কণ্ডের বর পেয়ে, অখণ্ড প্রমাই নিয়ে আকন্দ-ডাল মাথায় নিয়ে সে আছেন! জগতের অন্নধ্বংসাচ্ছেন আর কাজের মধ্যে কেবল যমদূতের মতন দু সারি যাকে পাচ্ছেন, ধরে ধরে নরকে পাঠাচ্ছেন, কারে ভাঙছেন কারে বা গড়ছেন, কেবল পরের কুৎসা নিয়েই আছেন, নৈলে যেন দিন যায় না! এ রক্তবীজের বংশ কি ছাই কমেও না? অদপ্রেয়েদের দোষ গুণের বিচার নেই, বাছাধনদের মুড়ি মিশ্রীর একদর,—ঘোলের দরে ক্ষীরের সাধ! তাই যদি ছাই একটু তারিপ করে, তো না হয় বুঝলুম যে এতটা পরিশ্রমের সব না হ'ক, তবু কতকটা ও সার্থক হ'ল, তাও ত নয়!!

আহা! এই হতভাগাদের জ্বালায়,—এদের রাঙা চোখের কট্‌কটে চাউনি,

মাঝে মাঝে নরমের উপর জোর তাজুনি আর ঝাঁকি মারা, আর থেকে থেকে হাম্বড় গোছের রংদার বোলচাল গুলো দেখে শুনেই কত শান্ত, শিষ্ট, ভাল মানুষের ছেলের যথার্থ স্বভাব কবি হওয়া ত দূরের কথা, হতে ইচ্ছা থাকিলেও তার চেষ্টা করবার যো নেই; বাছাদের মনের ফুল ফুটতে না ফুটতেই অম্নি কুঁড়িতে মুস্‌ড়ে যায়; আহা বেচারিরা আওতার গাছের মতন আর বাড়্‌তে বা মাথা কাড়া দিয়ে উঠ্‌তে পারে না, পরে ক্রমেই অল্পে অল্পে শুকিয়ে আসে।

তার পর—অকাল মৃত্যু আর অপমৃত্যু এ গুলো যেন কবিদের একেবারে একচেটে গালাগাল—যেন বংশগত ব্রহ্মশাপ! এইতেই ত ভারতটা বিশেষ বাঙ্গলা দেশটা একেবারে উৎসন্ন গেল, নৈলে এতদিন এখানে কবি আর ধরতো না;—এই দেখনা কেন চোখের উপর ক বছরের মধ্যে কতগুলো কবি এলো, আর যেমন তাদের দেখে শুনে লোকের চোক টাটাতে লাগলো, অম্নি তারা একে একে ঝাঁ ঝাঁ করে শেষ রাত্রের তারার মতন, কে কোথায় চলে গেল!

শ্রীতারকনাথ সরকার।

কুলস্ত্রীর কর্ত্তব্য!

আমি একজন অশিক্ষিত, অপরিণত বয়স্ক ও সংসার-নীতি অনভিজ্ঞ বঙ্গীয় যুবক; সে কারণ,—একেবারেই অন্তঃপুর অবরুদ্ধা কুল ললনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে একান্ত দৃষ্টতা এবং তদ্বিষয়ে সিদ্ধি-লাভের আশাও নিতান্ত দুরাশা বা 'আকাশ-কুসুম' মাত্র!

সহসা এভাবে সাধারণ সমক্ষে সমুপস্থিত দেখিয়া অনেকেই আজ আমাকে বাল সুলভ-চাপল্য-প্রণোদিত বোধে আন্তরিক বিরক্তি প্রকাশ করিবেন, কেহবা গোপনে কত কুভাব ও কুতর্কের অবতারণা করিয়া লইবেন, আবার কত মার্জ্জিত-রুচি পাঠক পাঠিকা মনে মনে কত অশ্লীল বাক্যবাণ প্রয়োগেও যে কুণ্ঠিত হইবেন না, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই! তাহা করুন, কি করিব? যিনি যাহাই কেন মনে করুন না, বা যাহাই কেন বলুন না, তাহাতে আমার কোনও রূপ ক্ষতি নাই বরং লাভের সম্ভাবনাই অধিক।

যে হেতু স্বল্পমাত্র বায়ু বিক্ষোভে নদীর তরল সলিল বিচলিত হয় ও ভীষণ আকার ধারণ করে সত্য; কিন্তু উহা'তে তাহার গতির কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না, কল্লোলিনীর কল কল ধ্বনিতে সুদূরবর্ত্তী সাগর-সঙ্গমে শান্তি লাভ যেমন অনিবার্য্য, আমিও সেইরূপ আমার প্রথম উদ্যমেই সমূহ বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইলেও আপন গন্তব্য-পথে উদ্দেশ্য সাধনে চির-অবিচলিত থাকিতে প্রাণান্ত পণে প্রয়াস পাইব। তবে জানি না, সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিদাতা সেই পরম পিতা পরাৎপরের মনে কি আছে!

এক্ষণে যদিও আমি এই সবে, শৈশবের হাত এড়াইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছি মাত্র, এবং যদিও আমি সংসার রূপ বিষ বৃক্ষের এই সবে তলায় আসিয়াছি এবং বৃক্ষ আরোহণের, তারপর তাহার ফল লাভের যদিও এখ‌ও আমার অনেক বাকী;—তথাপি চারি দিকে পাঁচ জনের দেখিয়া শুনিয়া আভাসেই বেশ বুঝিয়াছি যে,—কুল-কামিনীগণের স্বভাব ও মতি গতি যতটা সম্ভব পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত না হইলে হিন্দু বাঙ্গালীর আর কিছুতেই লেশমাত্র সুখের আশা বা সম্ভাবনা নাই—যাহার গৃহ ও গৃহ লক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ এতদূর অধিক, যে আত্মোন্নতির সমধিক নিশ্চয়তা ও সম্ভাবনা স্বত্ত্বেও বিদেশ গমনে একান্ত বিমুখ, যে গৃহে থাকিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে তথাপি একপদ বহির্গমন করিয়া হাতে হাতে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে স্বল্পমাত্রও সম্মত নহে;—যে অনশনে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, অবলীলা ক্রমে পরের দাসত্ব শৃঙ্খল, সহাস্য বদনে ও পরম আনন্দে চিরদিন গলদেশে বহন করিতে পারে,—যে অনায়াসে শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ-আরণ্যপ্রদেশে একাকী বাস করিতে সাহসী হইবে, প্রাণান্তপণে অসাধ্য সাধনে ও সম্মত হইবে, বল' ত যে সু-উচ্চ হিম-গিরির উন্নত শিখর গৌরীশঙ্কর হইতে লম্ফ প্রদানে ও সম্মতি প্রকাশ করিবে, পুণ্য কামনায় আপন বক্ষস্থল বিদারিত করিতে, স্বহস্তে আপান চক্ষুরুৎপাটন ও তৎসদৃশ নানরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে আপন দেহ পাত করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইবে না;—যে সসাগরা ধরার সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে স্বীকৃত হইবে ও সাময়িক উল্লাস প্রকাশ করিবে, সে সব পারিবে; কিন্তু এমন হতশ্রীর মধ্যে ও এমন দুর্দিনে কৈ একজনও খুঁজিয়া বাহির কর দেখি, যে আপন পুরাঙ্গনাগণের মধ্যে কাহারও বিন্দুমাত্র কুৎসা

প্রচার বা অখ্যাতি বাদ নীরবে সহ্য করিতে পারে! এমন কাহাকেও পাইবে না, কেহই উহা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না:—বিন্দুমাত্রও শোণিত ধমনীতে প্রবাহিত থাকিতে হিন্দুর সন্তান, বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালী তাহা কথনই সহ্য করিতে পারিবে না!

সে নিজের মস্তকে এককালীন সহস্র বজ্রপাত অবাধে সহ্য করিতে পারিবে, অজগর কালভুজঙ্গের মুখ মধ্যে হস্ত প্রদান করিতে পারিবে, নিজে হাসিতে হাসিতে ভীষণ যুপকাষ্ঠে আপন গলদেশ প্রবিষ্ট করাইয়া, ভৈরব মূর্ত্তি জল্লাদের শোণিত-পিপাসু ভীম খড়্গে আত্মবলি দিতে সমর্থ হইবে;—কিন্তু তাই বলিয়া সে কথনই কুলস্ত্রীর কুৎসা বা অবমাননা তৃণাগ্রেও সহ্য করিতে পারিবে না!

কেহ যদি কথনও বিদ্রূপচ্ছলে ঐরূপ কুৎসা রটনা বা প্রকাশ করে, তবে সে হিন্দু-বাঙ্গালীর পরমবন্ধু হইলেও, সে নিশ্চয়ই তাহাকে ঘোর শত্রু বিবেচনা করে, পরম আত্মীয় হইলেও সে তাহাকে আজীবন অন্তরে অন্তরে পর হইতেও পর জ্ঞান করে; তাহার কথায় তাহার (হিন্দু বাঙ্গালীর) হৃদয়ে এককালে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে; সে তাহার সেই কথায় বিষম প্রমাদ গণনা করে, সমগ্র জগত সহসা অন্ধকার দেখে, এমন কি আপন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে হতাশ হয়! হায়! ঐ পাপ পথের পথিক চির নির্ব্বাসিত দুরাত্মা নর-পিশাচ—চির-জীবন দূর-দীপান্তরে যাপন করিবার জন্যই যাহার নরদেহ ধারণ, যাহার আর ইহ জীবনে আত্মীয় স্বজনগণের মুখাবলোকনও নিতান্ত অসম্ভব, সেই যদি কথনও কোনওরূপে আপন পৌরস্ত্রীগণের সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করে বা জানিতে পারে, যে তাহারা সকলেই আত্ম-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পুণ্যকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছে, তবে তাহারও মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয় না? সে কি আপনাকে ধন্য ও পরম চরিতার্থ মনে করে না? স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব স্মরণ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও কি তাহার হৃদয় শতগুণে উন্নত হয় না? দীর্ঘ-কাল দূর-প্রবাসী হিন্দু-বাঙ্গালী,—যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আপন প্রিয়তমা প্রণয়িনীর মুখালোকনেও মধুর সম্ভাষণে প্রয়াসী হইয়া, সে আপন কুল ধর্ম্মের বশবর্ত্তিনী হইয়া জীবন যাপন করিতেছে, এই বিশ্বাসেই যাহা কিছু সুখ-শান্তি-সম্ভোগ করিতেছে, সে যদি সহসা ঘুণাক্ষরেও শুনে যে তাহার সেই প্রাণাধিকা প্রেয়সী আজ তাহার সেই চির-সঞ্চিত বিশ্বাস-রত্নে ডাকাতি করিয়া ভীষণ নরক-

রাজ্যের অধিশ্বরী হইতে বসিয়াছে,—তখন তাহার মনে হঠাৎ কি ভাবের উদয় হয়? তখন তাহার হৃদয় কি ক্ষোভে, হুতাশে, অভিমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও মর্ম্ম বেদনায়, শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় না? তখন তাহার কি আর জীবন ধারণে একটু মাত্রও সাধ থাকে? সে কি তখন সর্ব্বদা কেবল আত্মনাশে সাহসী ও যত্নবান হয় না? এ কথার উত্তর কে দিবে? ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে আমার শক্তি ও শিক্ষা এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই, যদি পারেন, ভুক্তভোগী সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরই এ বিষয়ের মীমাংসার ভার রহিল!

পরন্তু যখন পুর স্ত্রীগণ, হিন্দু বাঙ্গালীর এত গৌরবের, এত আদরের ও এত হৃদয়ের সামগ্রী, তখন তাহাদিগের মতি, গতি ও চরিত্রাদি পরিমার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ হওয়া, যে কতদর উচিত তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসেই অনুমাণ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে কুলস্ত্রীগণই আধুনিক বঙ্গ-সমাজের একমাত্র ভিত্তি স্বরূপ ... ... প্রকৃত পক্ষে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজের ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতি, অবনতি এমন কি উহার ভাবী সুখাসুখও কুল-ললনাগণের হস্তে সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত। বলিতে কি শুধু বঙ্গদেশ কেন, যে দেশেই কুল-কামিনীগণের স্বভাব, চরিত্র ও মতি, গতি যত অধিক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইবে, সে দেশ তত অগ্রে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে স্বতঃপরতঃ সমর্থ হইবে। যে হেতু এই সসাগরা ধরার যে অংশেই যাও না কেন, যেখানে মানব-সংস্থান আছে, সেই খানেই দেখিবে প্রত্যেক সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের তত্ত্বাবধানের, বিশেষতঃ শিশু-শিক্ষার সম্পূর্ণভার উহার গৃহ-লক্ষ্মীরই উপর! ফলতঃ এমন অবস্থায় যদি সর্ব্বকর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী-ভূতা গৃহলক্ষ্মীর নিজের চরিত্রাদিই কিঞ্চিন্মাত্রও কলুষিত হয়, তবে তিনি কি কখনও আপন উদাহরণে স্বকীয় সুতাসুতের চরিত্র গঠনে স্বল্পমাত্র ও সক্ষম হইতে পারেন না, আবার তিনিই ভাবী বংশাবলীর চিরস্মরণীয় ও অনুকরণীয় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পরম্পরা রাখিয়া যাইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে? তিনি যদি আপন সাংসারিক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুহে সর্ব্বদা উপেক্ষা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ কি স্বতঃই তাঁহার চরিত্র বা আচরণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে না? না ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগেরও চরিত্রাদি ধীর প্রবাহিনী অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর স্রোতের মত ধীরে ধীরে কলুষিত হইতে

থাকিবে না? যদি তাহাই হয়, তবে অল্পে অল্পে জলিতে আরম্ভ করিয়া বন মধ্যস্থ শুষ্কতরু-কোটরাভ্যন্তর্গত সামান্ত অগ্নিকণা যেমন পরিশেষে ভীষণ আকার ধারণ করতঃ সমুদায় বনকে এককালে ধ্বংস করে; অথবা সুবৃহৎ অট্টালিকার ভিত্তি ভূমিতে কোনরূপ দোষের সঞ্চার হইলে, কালে যেমন তাহার পতন অনিবার্য্য, বলিতে কি, তাহা হইলে এই সুমহান্ বঙ্গ সমাজও কি একদিন নিশ্চয়ই সেই ভীষণ ও শোচনীয় দশাপন্ন হইবে না? তাই বলি, যখন সামান্ত সাংসারিক কার্য্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, আমাদের অতি গুরুতর সামাজিক সকল বিষয়েও আমাদিগকে কুলস্ত্রীগণের এতদূর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে ও হইতেছে,—তদ্ভিন্ন, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবে বলিয়াই যখন পরিণীতা পত্নীর অপর একটী নাম—"সহধর্ম্মিনী" তখন তাহাদের স্বভাব ও মতি, গতি মার্জ্জিত হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন, এ কথা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে? সুতরাং এই চরিত্রাদি গঠন ও পরিমার্জ্জনের জন্ত কি কি অনুষ্ঠানের আবশ্যক,—যদি হৃদয়বান পাঠক ও মনস্বিনী ভগ্নী পাঠিকাগণ এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ না করেন, তবে—উপসংহারে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—যখন অবিবাহিতা সামান্যা বালিকা অবস্থায় স্ত্রীগণকে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে হয়, তখন পিতৃ গৃহই তাহাদিগের প্রধান আশ্রয়;—সুতরাং সে অবস্থায় তাহাদিগকে তত্রত্য সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হয়, তাহা না করিলেই নানা অবসাদ, এমন কি অনেক সময়ে অশেষ নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হয়। ফলতঃ এখানে পিতা মাতার ও অপর গুরুজনদিগের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়, কায়মনে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা ও সন্তোষ সাধন করিতে হয়; ভ্রাতা ভগ্নীগুলির প্রতি উচিত মত স্নেহ, অনুরাগ ও প্রেম প্রদর্শন করিতে হয়, এমন কি দাসীদিগকেও ভ্রাতা ও ভগ্নীর চক্ষে দেখিতে হয়;—তারপর যথা সময়ে পরিণীতা হইয়া, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিগৃহে গমন করিবার সময়ে আপন জননী বা জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বা অপর প্রতিবাসিনীগণ যে যে মৌখিক উপদেশ বাক্য প্রদান করেন, সেই গুলিকে সংসার-সাধনের মূল মন্ত্র বোধে চির-জীবন হৃদয়ের অতি পূজ্য ও গুহতম প্রদেশে রক্ষা করিয়া, কুলস্ত্রীগণের সর্ব্বথা তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য এবং সেই উপদেশ মত কার্য্য করিতে হইলে,—যখন ভাবী-

জীবনে সুখ লাভের প্রত্যাশায় দেবার্চ্চনায় ও দেবসেবায় এত অনুষ্ঠান, এত সংকোচ, এত সংস্কার ও এত চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন, তখন ইহ-জীবনে সংসার-অরণ্যের চির-সাথী, সম্পদ বিপদের ধ্রুব অবলম্বন ও একান্ত আশা-ভরসার স্থল, একমাত্র উপাস্য-জীবন্ত দেবতা পতি দেবের সেবায় কতই না সাবধান, সতর্কতা ও অনুষ্ঠানের আবশ্যক? তারপর ভাবিয়া দেখিলে বিবাহের পর হইতেই যখন পিতৃগৃহে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার সকল সম্পর্কই প্রায় একরূপ শেষ হইয়া আইসে, তখন সেই নূতন আবাস শ্বশুর গৃহই যখন চিরকালের বাস ভূমি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তখন সেই আবাসে বাস করিবার উপযুক্তা হইতে প্রয়াস পাওয়া, সকল কুলস্ত্রীরই একান্ত কর্ত্তব্য? আর ঐরূপ উপযুক্তা হওয়াও আমার মতে বোধ হয় ততটা কঠিন কার্য্য নহে, যেহেতু লেখাপড়া শিক্ষা ইত্যাদি নিজের আয়ত্তাধীন না হইলেও, মন সকলেরই স্বেচ্ছাধীন হইতে পারে, বলিতে কি আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে কোন্ কুল-ললনা তদীয় শ্বশুর-দেবকে আপন পিতৃ-স্থানীয়, শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে আপন জননী তুল্য, দেবর ও ভর্ত্তৃ-ভগ্নীদিগকে আপন স্নেহের সহোদর সহোদরার স্থানীয় করিয়া লইতে না পারেন?

যিনি তাহা না পারেন, তিনি প্রকৃত শিক্ষিতা হইলেও তাঁহার শিক্ষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, মূর্খ ধনী যেমন পরম ধনে বঞ্চিত, তিনিও সেইরূপ অন্য সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা এবং অলঙ্কৃতা হইলেও, জগতের চক্ষে না হউক, সমাজের চক্ষে, না হউক, অন্ততঃ আমার চক্ষে নিতান্ত নির্গুণা! যিনি, তাহারা হাসিলে হাসিতে, তাহারা কাঁদিলে কাঁদিতে, তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ বোধ করিতে, তাহাদের সম্পদে সম্পদ, বিপদে বিপদ জ্ঞান করিতে, মর্ম্ম-বেদনায় ব্যথিতা হইতে,—ফল কথা—তাহাদেব সহিত মনে প্রাণে মিশামিশি করিতে শিখেন নাই, তাঁহার শিক্ষা শিক্ষাই নহে,—প্রকৃত পক্ষে, তিনি যথার্থ কুলস্ত্রী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্যা! তাঁহার নিকট সমাজের অণুমাত্রও উপকারের আশা করা, আর মরীচিকাময় প্রদীপ্ত সাহারা মরুতে সুশীতল সলিল প্রার্থনা করা, একই কথা।

শ্রীতারকনাথ সরকার।

শ্রীরামপুর।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক।

৪র্থ বর্ষ। } আষঢ়, শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল। { ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

সূচী।

(প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিনিময় পত্র ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে ৮৩নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

আলোচনার কার্য্যালয়—৯নং মজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র] [প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄১০ আনা।

আলোচনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনী।

৪র্থ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩০৭ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

হিন্দুর শাস্ত্র শিক্ষা।

পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণের প্রতিপালিত হিন্দুধর্ম্ম মানিতে হইলে, তাহার পবিত্রালোকে হৃদয় আলোকিত করিতে হইলে, শাস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন, হিন্দুর বেদান্ত-দর্শন রূপ কল্প বৃক্ষের আশ্রয় ভিন্ন গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংস্কৃত শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, সংস্কৃত না জানিলে হিন্দুশাস্ত্র আয়ত্ত করা যায় না, হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা ও তৎসহ সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি যেমন আবশ্যক, সদগুরুর উপদেশও তেমনি আবশ্যক, গুরু ভিন্ন এই গুরুতম শিক্ষার, এই অতলস্পর্শ সাগরসম হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা একবারেই অসম্ভব। অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্র সংকীর্ণ নহে, বেদের কথা ছাড়িয়া দিউন, প্রথম শিক্ষার সোপান স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিও পড়িয়া শেষ করা যায় না, তাহার সংখ্যাও অসংখ্য! অপর ধর্ম্মে যেমন এক একখানি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিলেই ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ইহা তাহা নহে, ইহার অগণ্য গ্রন্থ, ইহা এক জন্মেও শেষ করিবার নহে। এই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট

হইয়া উপদেশ গ্রহণ করিলে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার পরম পবিত্রভাব হৃদয়ফলকে অঙ্কিত করিতে পারা যায়। কিন্তু এই বর্ত্তমান [illegible] সদ্গুরুর নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এক প্রকার [illegible] যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভণ্ডের ভণ্ডামীতে, জুয়াচোরের জুয়াচুরীতে হিন্দু ধর্ম্ম আজকাল মলিনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমশঃ ইহার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে হইলে যখন শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন কোন প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তখন নিজে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া,—ইঁহার পবিত্র শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন কর; নিজের চেষ্টায় ইহার গুহ্য বিষয় সকল বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে হিন্দুধর্ম্ম কি পরম পদার্থ, ইহার ভিতর কি স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারিবে; তখন জানিতে পারিবে হিন্দুধর্ম্ম কি চমৎকার জিনিস।

এখন সদ্গুরু মেলা ভার হইয়াছে। কারণ এখন আর হিন্দু রাজা নাই হিন্দুর ধর্ম্ম যাজক সাধুচেতা উদার হৃদয় ব্রাহ্মণ বংশের প্রায় উচ্ছেদ হইতে বসিয়াছে। যখন ব্রাহ্মণের পরিপোষক ও রক্ষক রাজা নাই, যখন ধর্ম্মের রক্ষক শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণও নাই, তখন আর ইহার মর্য্যাদা রক্ষা হইবে কিসে? কেই বা ইহার আদর করিবে, সকলেই পেটের জ্বালায় অস্থির। আর কি ধর্ম্মের রক্ষক রাজা পরীক্ষিত আছেন, যে কলির গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, ধর্ম্মের মহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইবে?

এক্ষণে রাজা আমাদের বিজাতীয়, কালও ঘোর কলি, ধর্ম্মও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া একপাদ পরিমিত হইয়াছে, জাল জুয়াচুরী শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি এক্ষণে কাল মাহাত্ম্য হইয়াছে। এই জন্যই ধর্ম্মের উপদেষ্টা সদ্গুরু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে। এখন নিজের চেষ্টা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, এক্ষণে নিজে নিজে শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া ধর্ম্মভাব উপলব্ধি করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়; বিষয় চর্চ্চার সহ ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

বর্ত্তমান কালে কেবল শাস্ত্রকে গুরু করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করাই উচিত। পবিত্র মনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বহু বৎসরের পর হৃদয়ে যে ভাব বদ্ধমূল হইবে তাহাই পরম পবিত্র ও চিরস্থায়ী ভাব। তাহাই তোমার প্রাণের সহিত সংবদ্ধ

হইয়া, তোমায় কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিবে। এই কলিযুগে শাস্ত্র ছাড়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই। এই রত্নাকর সদৃশ হিন্দু শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও পাইবে না ; তাই বলিয়াছি—ইহার সহিত অন্ত ধর্ম্মের পার্থক্য অনেক। আমাদের ধর্ম্মে পাপ ও পুণ্যের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না, শাস্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইলে, ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইতে পারিলে, তবে মুক্তি পথের পথিক হইতে পারা যায়। পাপ ও পুণ্যে কেবল অবস্থার তারতম্য হয় মাত্র। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, ত্রিলোকে তাহার আর চিন্তার বিষয় কিছুই নাই, ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, কাহার সাধ্য তাঁহার অনিষ্টাচরণ করে।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে মরিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা কি তাহার সফল হইয়াছিল? বরং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া নিজের জীবনকেও দুর্দ্দশাগ্রস্থ করিয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষীয়, হরি-প্রেমে আত্মহারা ধ্রুবকে সেই হিংস্র জন্তু সমাকুল বিজন বনে কে রক্ষা করিয়াছিল। যখন শিশু মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ডাকিত—"পদ্মপলাশলোচন হরি, তুমি কোথায় ঠাকুর!" তখন কই ব্যাঘাদিতেও তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই? কিন্তু অন্য শাস্ত্রের উপদেশ এরূপ নহে। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে,যখন এডাম এবং ইভ ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হইয়া ইডেন উদ্যানে প্রেরিত হয়, তখন সয়তান আসিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের অনিষ্ট করিয়াছিল। এ কিরূপ উপদেশ, ভগবানের দ্বারা রক্ষিত যে ব্যক্তি, সয়তান তাহার অনিষ্ট করিল এবং তাহাতেই তাহাদের অধঃপতন হইল এ কিরূপ উপদেশ? আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ কিন্তু তাহা নহে, তাহার উপদেশ, ধ্রুব প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করিলেই বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যায়। এই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের প্রভেদ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

তাই বলিতেছি ভণ্ড লোকের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া বরং ভক্তি ভাবে নিজে নিজ শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তাহা অপেক্ষা বেশী ফল লাভ হইতে পারে! আজ কাল বড়ই বিষম সময় পড়িয়াছে, কে ভাল, কে মন্দ, কে মেকী কে খাঁটি, চিনিয়া লওয়া দায় হইয়াছে।

হবে কি ভাল লোক একেবারেই নাই, তাহা নহে। বিশেষ চেষ্টা করিয়া

হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র প্রাঙ্গন হইতে উপবৃক্ষ বা আগাছা সকল নষ্ট করিয়া, প্রকৃত ফলবান বৃক্ষ বাছিয়া লইতে পারিলে এখন ভাল জিনিস পাওয়া যায় কিন্তু এখন সেরূপ চেষ্টা কাহার আছে। এখন উদরান্নের চিন্তা করিবে না, গুরুর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবে? এইজন্য বলিতেছিলাম, নিজে নিজে যে টুকু অভ্যাস করিতে পারা যায়, সেই টুকুই ভাল; পবিত্র মনে শাস্ত্রের শাসনাধীন থাকিলে অবশ্যই ফল লাভ হইবে।

হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই; সকল ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু অন্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করা বড় কঠিন। এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম এক্ষণে অনেকের বিদ্বেষের বস্তু হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ইহার কখন উচ্ছেদ হয় নাই, হইবেও না; ইহার উপর দিয়া কত বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, মুসলমান রাজাগণের কঠোর তাড়নারূপ কত প্রবল ঝটিকা ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তথাপি ইহার কিছুই হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মরূপ মহা অট্টালিকার সাজসজ্জা সমস্তই গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বনিয়াদ পাকা, অনন্ত কালের সাক্ষী স্বরূপ—ইহা চিরকাল সমভাবে থাকিবে। কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রচারিত ধর্ম্ম হইলে, হিন্দুর আদি গ্রন্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রণীত হইলে, এতদিন ইহার অস্তিত্ব কি বর্ত্তমান থাকিত? যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাহার আবার উচ্ছেদ কি। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের কখনও অবসান হইবে না। হিন্দুজাতির অধঃপতন হইতে পারে, হিন্দুনাম জগত হইতে লোপ হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মের লোপ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কতবার কত লোকের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। কত বীর নিজ ভুজ বলে ইহাকে অধিকার করিয়াছে এবং কাল মাহাত্ম্যে পুনরায় এখান হইতে অপসৃত হইয়াছে। বীরগণের বিনাশ ঘটিলেও যে বসুন্ধরা সেই বসুন্ধরাই আছেন। সেইরূপ হিন্দুশক্তি সামর্থ্য হীন হইলেও হিন্দুধর্ম্ম হীন বীর্য্য হইবে না। যিনি সাধক ধর্ম্মবীর হইবেন, তিনি অবলীলাক্রমে ইহার চরণচ্ছায়ায় সুশীতল হইয়া, নিজ মন প্রাণ জুড়াইবেন, হৃদয়ে চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারিবেন। এইরূপ সাধু পুরুষই আমাদের প্রণম্য, তাঁহার চরণ ধুলি আমরা মস্তকে ধরিতে পারি। ভাই শিক্ষিত হিন্দু! কেন বৃথা সময় ক্ষেপণ

করিয়া আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ। বুঝিয়া দেখ, যাহা তোমাদের আছে, তাহার তুলনা নাই, অতএব ভক্তিভরে শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চেষ্টা কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। সম্পাদক।

বাঙ্গালীর অনুকরণ প্রিয়তা।

আজ কাল ভারতীয় কোন জিনিসের আর আদর নাই। বাঙ্গালা দেশের আদর নাই, বাঙ্গালা ভাষার আদর নাই, বাঙ্গালীর সাজ সজ্জার আদর নাই, বাঙ্গালী জাতির কোন আদর নাই। এখন ইংরাজের দেশের আদর, ইংরাজি ভাষার আদর, ইংরাজি সাজ সজ্জা, হাব ভাব প্রভৃতি সকলেরই আদর বেশী, মান বেশী। বাঙ্গালী আজ ইংরাজ সাজিয়া তাহাদের ধরণ ধারণ অনুকরণ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এই অনুকরণ প্রিয়তাই এখন সভ্য সমাজের আদরণীয় হইয়াছে। এখন তাহারা ইংরাজের সহিত একত্র আহার বিহার করিতে ভাল বাসে, ইংরাজের সহিত মিশিতে বা কথা কহিতে পারিলে তাহাদের মান সম্ভ্রম বজায় থাকে। কেন এমন হইল? কেন আজ ইংরাজির নামে বাঙ্গালী গলিয়া যায়, কেনই বা আজ ভারতবাসীর নিকট ইংরাজের নাম এত মধুতর, কেন আজ ভারতের ভাবী আশার ধন, ভারত সন্তান ইংরাজ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মাতৃভূমির বক্ষে পদাঘাত করতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাত যাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। কেন আজ বিলাতে যশ সৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত, আজ ইংরাজ জাতি জগতের মুকুটমণি হইয়া উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত? আর ভারত! হায় অভাগিনী, আজ কেন তোমার দুর্দ্দশার একশেষ, আজ তোমার হৃদয়পঞ্জর ভগ্ন কেন, হৃৎপিণ্ড বিদারিত, মুখম্লান, কর্ণ বধির, নানাবিধ দুঃখের করাল ছায়ায় নিষ্প্রভ, নির্জ্জীব কেন? তোমার দুরাবস্থার একশেষ হইয়াছে কেন মা! তোমার এতাদৃশ দীনহীন বেশ, কেন মা! তোমার হৃদয়ে সুখের লেশমাত্র নাই, কেন মা! তুমি দিন দিন এত মলিন ভাবাপন্ন হইতেছ? তুমিও মা! এক দিন সমগ্র পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করিতে, তুমিও ত একদিন সকলের পূজনীয় ছিলে, তোমারও

শিরোদেশে একদিন বিজয় কিরীট শোভমান ছিল চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় রাজাগণ প্রাণপণে তোমার সেবায় ব্রতী ছিলেন, তবে মা! তোমার অবস্থা এত শোচনীয় হইল কেন?

ইহার উত্তর আর কিছুই নহে, কেবল বাঙ্গালীর অনুকরণ প্রিয়তা দোষ, কেবল বাঙ্গালার অনুকরণ প্রিয়তা ও অপরিণামদর্শিতা দোষে অমর পূজিত ভারতের এই দুর্দশা হইয়াছে। আমরা মায়ের পুত্র হইয়া, মায়ের সুখের পথে কাঁটা দিতে বসিয়াছি, তাই তাঁহার এত কষ্ট, এত দুঃখ ও তাহার এই পরিণাম। আমরা প্রকৃত অনুকরণ কাহাকে বলে জানি না। সকল লোকেরই দোষ এবং গুণ উভয়ই থাকে কিন্তু আমরা ইংরাজের মহদ্‌গুণ সকলের কিছুমাত্র অনুকরণ করি না, বা করিতে জানি না। যে গুণে তাঁহারা জগন্মান্য হইয়াছেন, আমরা তাহার অনুকরণ করিনা, কেবল তাহাদের দোষের ভাগ অনুকরণ ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করি।

যে মহৎ অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া, যাহার অনুকরণ পথের পথিক হইয়া রুষিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, রোম, গ্রীস, জর্ম্মাণী প্রভৃতি জাতি, উন্নতির চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়াছে, আমরা মূর্খ বাঙ্গালী কেবল সেই অনুকরণের আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া দিন দিন অপদার্থ হইয়া যাইতেছি। অবশ্য আমরা স্বীকার করি, অনুকরণই উন্নতি—সোপানারোহনের একমাত্র পথ। পুত্র যেমন পিতার অনুকরণ করিয়া থাকে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন জেষ্ঠ ভ্রাতার গুণাবলী অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, বিজাত প্রজা যেমন রাজার অনুকরণ করিয়া নানাবিধ শিক্ষা লাভ করে, বহু বিষয়ে উন্নতি করিতে চেষ্টা করে, আমরা তাহার কিছুই করি না। ভাই ভারতবাসীন! ইংরাজের যে সমস্ত স্বর্গীয় গুণ আছে, যে সকল মহদগুণে ইংরাজ আজ সকল দেশের, সকল জাতির, এমন কি সমগ্র জগতের পূজনীয় ও বরণীয়, কই ভাই সে সকল গুণের প্রতি কি লক্ষ্য করিয়াছ? ইংরাজের দোষের ভাগ সামান্য, গুণের ভাগই বেশী, তোমরা তাহার কি অনুকরণ করিয়াছ ভাই! যদি ইংরাজের স্বদেশপ্রিয়তার অনুকরণ প্রতি একবার দেখিতে চাও, তবে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর,যদি তাহাদের জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিতে চাও তবে ইংরাজের লেখণীতে দেখ, যদি ইংরাজের শৌর্য্যবীর্য্য গাম্ভীর্য্য দেখিতে ইচ্ছা থাকে,

তবে দেখ ইংরাজের মুখমণ্ডলে ইহা মূর্ত্তিমান, যদি আত্মসম্মান কাহাকে বলে জানিতে চাও, যাও দেখ ইংরাজ সন্নিধানে, তাহাও দেদীপ্যমান। আর যদি তাঁহাদের প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে দেখ ইংরাজের শ্বেতোৎপল মণ্ডিত বাহু যুগলে।

বাঙ্গালি! তোমরা ইংরাজের কিসের অনুকরণ করিতেছ? তোমরা কি গুণে ইংরাজের সমকক্ষ হইতে যাও, কি গুণে তোমরা ইংরাজের নিকট আদর পাইতে ইচ্ছা কর। ইংরাজ কেবল গুণের পক্ষপাতী ইহা যেন স্মরণ থাকে, তোমরা যে দাঁড়কাক হইয়া ময়ূরের দলে মিশিতে চাও, কোন গুণে? দেখ, ইংরাজ ব্যবসা বাণিজ্যে সকল দেশ অপেক্ষা উন্নত, ইংরাজ দাসত্বে নারাজ, ইংরাজ স্বজাতী প্রেমে মুগ্ধ তাহাদের উন্নতির জন্য মুক্ত হস্ত। বল দেখি, কোন ইংরাজ কোন কাজ করিলে, সকলে মিলিয়া তাহার সহায়তা করে কিনা। কিন্তু তোমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত উৎসন্ন যাইতেছে, দেশীয় ভাষা লোপ হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি একবার ভুলেও দৃষ্টি কর কি? দেখ, ইংরাজের দেশে ইংরাজি ভাষায় কত শত পুস্তক, কতশত বহুমূল্যের সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে, গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ, অনায়াসে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আর তোমাদের দেশে গ্রন্থকারগণের এত দুরাবস্থা কেন, অন্নভাবে কেন তাহারা মারা যাইতেছে, সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের সম্পাদিত অল্প মূল্যের পত্রিকা অকালে লয় প্রাপ্ত হইতেছে কেন? ইহা কাহার দোষে, গ্রন্থকারের না সম্পাদকের? না তাহা কখনই নহে, ইহা তোমাদেরই দোষে। নবোৎসাহে যে অঙ্কুর বাঙ্গালী সম্পাদকের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছে, বঙ্গবাসী তাহাতে জল সেচন করিল না, কেহ তাহা গ্রহণও করিল না, বরং বলিল, এরূপ ধরণের বাঙ্গালা কাগজ প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে, অতএব ইহা বন্ধ হওয়াই ভাল, কেহ বলিল বাঙ্গালা কাগজ আবার পড়িব কি।

এই ত তোমাদের সুবুদ্ধির পরিচয়, এই ত তোমাদের অনুকরণ প্রিয়তার ফল? কিন্তু একবার ইংরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি, তাহারা কয় জন বিদেশীয় বিজাতীয় সংবাদ পত্র পড়িতেছে, কয়জন বাঙ্গালীর সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে, কয়জন তোমাদের মত দাসত্ব লাভের জন্য অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা বাঙ্গালী, যদিও শিক্ষিত হইয়াছি, তথাপি এখন অজ্ঞান,

জ্ঞানের লেশ মাত্র এখন আমাদের নাই, আমরা অন্ধ ও বধির, তাই আমরা স্বজাতি ও স্বদেশের সুখ স্বাচ্ছন্দে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আমরা বালক, তাই রত্ন চিনিতে না পারিয়া অবহেলায় তাহা ফেলিয়া দিতেছি, মুক্তাভাবে শুক্তার আদর করিতেছি।

এইজন্য বলিতে হয় প্রকৃত অনুকরণ শিক্ষা আমাদের এখনও হয় নাই। কিন্তু আমাদের অতীব সৌভাগ্যের বিষয় যে, এক্ষণে আমরা ইংরাজ প্রসাদাৎ সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, ইংরাজ অনেক বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু আমরা মূঢ়, তাই সে শিক্ষার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না, সেই শিক্ষা অনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করি না। এক্ষণে যদি তোমাদের উন্নতি করিবার আশা থাকে তবে ইংরাজের সমস্ত সদ্‌গুণের অনুকরণ করিতে হইবে, তাহাদের মত নানাবিধ সৎ কার্য্যে ব্রতী হও, বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ কার্য্যের সুকৌশল প্রকাশ করিয়া, দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা কর, দেশের উন্নতি না হইলে, তোমার উন্নতি কোথায়, তোমার অস্তিত্ব কোথায়। যত দিন কেবল মাত্র হাব ভাব অনুকরণে ব্যস্ত থাকিবে, ভারতবাসী! ততদিন তোমাদের উন্নতি সুদূর পরাহত, ইহা স্থির নিশ্চয়। সম্পাদক।

৺ রজনীকান্ত গুপ্ত।

সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, শক্তিশালী লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আর ইহলোকে নাই। গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি ১টা ২৭ মিনিটের সময়,—বহুমূত্র জনিত দুষ্টব্রণ রোগে, একান্ন বৎসর বয়সে, তিনি পরলোকযাত্রা করিয়াছেন।

রজনী বাবু বহুগুণশালী ছিলেন। সাহিত্যে যেমন শক্তিমত্তা দেখাইয়া সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিনয় নম্রতা, ধীরতা এবং সর্ব্বোপরি সচ্চরিত্রতা দেখাইয়া তেমনই আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট যশস্বীও হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও কথায় থাকিতে ভাল বাসিতেন না;—কাহারও বিষয় লইয়া কখন বেশী ঘোঁটও করিতেন না। সাহিত্যের তথা সভা-সমিতির এই ঘোর

দলাদলির দিন, রজনী বাবু কোন দলের মোড়ল হন নাই। কার্য্যানুরোধে সময় সময় কোন কোন দলভুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও অতি সন্তর্পণে।

কেবলমাত্র সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া, গুপ্ত মহাশয়, বিলক্ষণ সম্মান সহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। এই কলিকাতা সহরের চাঁপাতলায় তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকা মুল্যের দ্বিতল বাটী করিয়া গিয়াছেন, একটী ছাপাখানা রাখিয়া গিয়াছেন এবং পুস্তকের আয়ে পোষ্য পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহেরও সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবীর পক্ষে ইহা যে, বিশেষ গৌরব ও আনন্দের বিষয়, সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে, সন ১২৫৬ সালের ভাদ্র মাসের ২৯শে তারিখে বৈদ্যবংশে রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কমলাকান্ত গুপ্ত। কমলাকান্তের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ। রজনীকান্তের পুণ্যবতী জননী, সকল সন্তানকে রাখিয়া, ইতি-পুর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রজনীকান্তের বাল্যশিক্ষা দেশেই হইয়াছিল। তেওতার আংলোভার্ণাকুলার স্কুলেই তিনি পাঠ করিতেন। ক্লাশের তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। সাত আট বৎসর বয়সে তিনি কঠিন জ্বররোগাক্রান্ত হন। তাহাতে জীবনের আশা ছিল না। যাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি রোগমুক্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার শ্রবণ শক্তি জন্মের মত দুর্ব্বল হইয়া গেল। এই অবস্থাতেও তিনি যথাকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন; চারি টাকা হিসাবে চারি বৎসরের জন্য একটী বৃত্তিও পাইলেন। এই বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতা আসিলেন; সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

কলিকাতায় হিন্দুহোষ্টেলে থাকিয়া, তিনি সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিতে থাকেন। তখন হইতেই তিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমে কর্ত্তব্য পথে চলিতে আরম্ভ করেন। সেই হিন্দুহোষ্টেলে অবস্থানকালে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ "জয়দেবচরিত" প্রকাশিত হয়। পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় তখন হইতেই তাঁহার গ্রন্থপ্রচারের সহায় হন।

রজনীকান্তের অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কবিরাজী শিক্ষা করেন, কিন্তু আজীবন সাহিত্যানুরাগী রজনীকান্ত সে পথে যান নাই।

সুপ্রসিদ্ধ "সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস" রজনীকান্তের প্রধান কীর্ত্তি। বড় সুখের বিষয়, এই মহাগ্রন্থ রজনীকান্ত শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। প্রথম চারি ভাগ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল ;—পঞ্চম বা শেষভাগ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মুদ্রণাদিকার্য্যও শেষ হইয়াছে। কালের আহ্বানে কীর্ত্তিমান্ গ্রন্থকার মরলোকে কীর্ত্তি রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন,—দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার বড় সাধের—বড় যত্নের—বড় আদরের 'সিপাহিযুদ্ধে'র শেষভাগ, তাঁহার ভক্ত পাঠকবৃন্দ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন! এই 'সিপাহিযুদ্ধ'ই রজনীকান্তের উন্নতির প্রথম সোপান ; হায়, ইহাই শেষ! বুঝি তিনি 'শেষ দিন' নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন ; তাই অত ব্যাকুলভাবে, ব্যগ্রতাসহকারে গ্রন্থের মুদ্রণাদিকার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। তাই ইদানী নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। স্বধর্ম্মে আস্থাবশতঃ তাই ইদানী প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতেন এবং কাহারও সহিত দেখা হইলে বলিতেন, 'কেমন আমাকে ভাল দেখিতেছ ত?' বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বুঝি,রোগের যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নাই, একটু হা-হুতাশ করেন নাই,—পরিবারবর্গ আত্মীয়স্বজন কাহাকেও কিছু বলিয়াও যান নাই। যে কয়দিন শয্যাশায়ী ছিলেন, নীরবে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া গিয়াছেন! আড়ম্বরহীন জীবন, অনাড়ম্বরেই শেষ হইয়াছে।

'সিপাহিযুদ্ধ' ও 'আর্য্যকীর্ত্তি' ব্যতীত, আরও বহু গ্রন্থে, রজনীকান্ত বাঙ্গালা ভাষা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নবভারত, ভারত প্রসঙ্গ, বীরমহিমা, প্রতিভা, ভীষ্মচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ঐ সকল গ্রন্থ সাহিত্যের গৌরব।

স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নে রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "বোধবিকাশ". "রচনা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার পরিচয়-স্থল।

রজনীকান্তের ভাষা বিশুদ্ধ ও গম্ভীর। ভাষা ব্যাকরণ দোষদুষ্ট, অস্পষ্ট কিংবা অসংযত নয়।

রজনীকান্তের সেই গালভরা উচ্চ সরল হাসি ও নির্দ্দোষ আমোদ,—যিনি জীবনে একদিন উপভোগ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। রজনীকান্তের গুণগ্রামে আমরা মুগ্ধ। তাঁহাকে এত শীঘ্র যে আমরা হারাইব, ইহা কখনও ভাবি নাই। (বঙ্গবাসী।)

ভারতে দুর্ভিক্ষ।

কি ছিল, কি হইয়াছে। সোনার ভারত ছারক্ষার হইতে বসিয়াছে, অনুমান এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতের পর্ণ কুঠির হইতে রাজপ্রসাদ পর্য্যন্ত ধন ধান্য ও সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে লক্ষীর ভাণ্ডার ভারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শষ্যাদি উৎপন্ন হইয়া অধিবাসীগণের দৈন্যতা দূর করিত, আজ সেই অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ভারতে অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্র অভুক্তগণের কাতর ক্রন্দনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ভারতের উৎপাদিকা শক্তি চির প্রসিদ্ধ, ইহার জমি সকলের উর্ব্বরতা শক্তি অপর দেশের জমি অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক, কিন্তু ক্রমশঃ যেরূপ অবস্থা দাঁইতেছে, প্রতি বৎসর যেরূপ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে অন্নগত প্রাণ ভারতবাসীর অদৃষ্টে যে কি হইবে, তাহা লেখণীতে বিবৃত করা যায় না। পরিণাম ভাবিয়া প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠে, হতাশ অবসাদে হৃদয় ভারিয়া যায়, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়, হায়! যে ভারতবাসীকে অন্নের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইত না, যাহারা উদর জ্বালা কাহাকে বলে জানিত না। আজ সেই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে অন্ন নাই, অধিবাসীগণ উদর জ্বালায় পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, ইহা কি কম ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয়?

পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা যেরূপ উন্নত ছিল, এক্ষণে দিন দিন সেইরূপ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ভারতের ন্যায় এমন হতভাগ্য দেশ বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। অধুনা এদেশে প্রতি বৎসর যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইতেছে, ভারত বাসীকে যেরূপ অন্নকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, সেরূপ আর কোন দেশে, কোন লোককে সহ্য করিতে হয় না। একের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে না পাইতে নূতন দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, সহস্র সহস্র লোককে উদরসাৎ করিয়া, রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য আমাদের বদান্য গভর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিতেছেন, দেশ বিদেশে কত রিলিফ কার্য্য খুলিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী সকল চেষ্টাই

বিফল করিয়া দিতেছে, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ রাজকেও ইহার জ্বালায় ব্যতি-ব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অধিবাসীগণের সকলেরই কষ্ট হয় বটে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রমজীবী,কৃষিজীবী, শিল্পকরদিগের কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাহাদের টাকা আছে. বিষয় সম্পত্তির অধিকারী ধনীগণ অন্নভাবে প্রাণে মারা যায় না। প্রাণে মরে, কেবল দরিদ্রগণ, যাহাদের অর্থ নাই।

শ্রমজীবীর মধ্যে যাহারা পরপদানত, পরের দাসত্ব করিয়া, শারীরিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া, যাহাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়, এ দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক।

আশানুরূপ বর্ষা না হইলে এদেশে শস্য উৎপন্ন হয় না। সময়ে সময়ে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইয়া যায়। শস্য না হইলেই দরিদ্র কৃষকগণের দুরাবস্থার একশেষ, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়, কিরূপে পরিবার প্রতিপালন করিবে, কিরূপে জমির খাজনা দিবে বা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবে, ইহাই তাহাদের দুর্ব্বিসহ চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। তাহার পর আগামী বর্ষে কিরূপে ভূমি আবাদ হইবে, গৃহে ত সঞ্চিত অর্থ নাই যে, তাহার দ্বারা চালাইবে, কাজেই দুর্ভিক্ষের করাল দংষ্ট্রে চর্ব্বিত হইতে হয়। এখন ভারতীয় শিল্পের আর তত আদর নাই, সুবৎসরেও শিল্পকরগণ অতিকষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করে, দুর্বৎসরে দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের অবস্থা যে কত মন্দ হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করা যারপর নাই কঠিন ব্যাপার।

আমাদিগকে যে অনবরত এতকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, তাহার বহুবিধ কারণ সত্ত্বেও তিনটী বিষয় প্রধান। প্রথমতঃ দেশের উৎপন্ন ফসল সকল দেশে থাকিতে পায় না, অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া চলিয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে পাই কি, না কতকগুলি অব্যবহার্য্য পদার্থ, যাহার আবশ্যক নাই, যাহা না হইলে কোনই কষ্ট হইবে না, ভারতবাসীর রক্তের বিনিময়ে সেই সকল অকিঞ্চিৎ কর দ্রব্য আমদানী হইতেছে, এতকষ্ট সহ্য করিয়াও আমরা তাহা আদরে গ্রহণ করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এখন পরাধীন জাতি হইয়াছি, আমাদের বাণিজ্য ব্যক্তি-

য়াছে, একণে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদেই সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়, সঞ্চয় অতি অল্পই থাকে, কাহার বা কিছুই থাকে না। কাজেই আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীর দুর্মূল্যের সময় হাহাকার করিতে হয়, সভ্যতালোকে আলোকিত ভদ্রসন্তান উদরের জন্ত ভিক্ষাও করিতে পারে না, মানের দায়ে গভর্ণমেণ্টের রিলিফ কার্য্যেও যোগদান করিতে পারে না, তখন তাহাদের ঋণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই, কিন্তু যাহার সম্পত্তি নাই সে ঋণ করিবে কিরূপে, আর কেই বা তাহাকে টাকা ধার দিবে? কাজেই দুর্ভিক্ষের সময় এই শ্রেণীর লোকদের কষ্টের একশেষ হয়। তৃতীয়তঃ জাতীয় ব্যবসায়ের অভাব, আজ কাল ব্রাহ্মণে আর ব্রাহ্মণের কার্য্য করে না। পুরুষানুক্রমে যাহারা যজন, যাজন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহারা দাসত্বে রত হইয়াছে, দেব সেবায় আর তাহাদের মন নাই, এখন তাহারা শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলে, প্রণামের স্থানে ইংরাজী প্রণাম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

এখন ভারতে জমির অভাব নাই, এখন যথেষ্ট পতিত জমি ভারতে রহিয়াছে কিন্তু তথায় আবাদ কে করিবে? ভারত চাষার দেশ কিন্তু একণে চাষারও অভাব পড়িয়াছে, অনেক কৃষক এখন নিজ সন্তানগণকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা না দিয়া লেখা পড়া শিখাইতেছে, এইজন্ত আমাদের দেশে কৃষকেরও অভাব হইয়া পড়িতেছে। যাহারা আছে বা যাহাদের কৃষি কার্য্যে আস্থা আছে তাহাদের অবস্থাও অতীব শোচনীয়, নানাপ্রকার ঋণ দায়ে জড়ীভূত হইয়া নানারূপ চিন্তায় একরূপ মৃত প্রায় হইয়াছে। আমাদের এই সমস্ত দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া, ভারতবাসীর পরিণাম ভাবিয়া, আজ কাল অনেক কৃতবিদ্য, বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তিগণ তন্নিবারণে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

সে দিন লক্ষ্ণৌ সহরে জাতীয় মহাসমিতির যে পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের মাননীয় সভাপতি মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত মহশয় এ বিষয়ের বক্তৃতা করিয়া কথঞ্চিৎ আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মধ্য ভারতের কৃষিজীবি ব্যক্তিবর্গের অবস্থা বড়ই মন্দ, তাহাদিগকে ভূমির জন্ত যে কর দিতে হয়, তাহাদের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে তাহা অতি বেশী বলিয়া বোধ হয়, সেই কর দিয়া তাহাদের কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। এই সকল দুঃস্থ কৃষকগণের একটা স্থায়ী কর স্থাপন করা উচিত।

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে দত্তজ মহাশয়ের এই সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফ কার্য্যে অনেক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোককে অন্নদান করেন, প্রকৃতপক্ষে যাহারা খাইতে পায় না, যথার্থ যাহাদের অভাব আছে, এবার হইতে বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ লোককে রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। এ নিয়ম আমাদের মতে মন্দ নহে, কিন্তু যাহারা রিলিফ কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, তাহারা প্রকৃত দুরবস্থাপন্ন কিনা গভর্ণমেণ্ট যেন ধীর ও স্থির ভাবে তাহার বিচার করেন, কোন সদ্বিবেচক দয়ার্দ্রচিত্ত লোককে যেন এই সকল নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হয়। তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে, পরন্তু কোন অত্যাচারও সংঘটিত হইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশে উৎপাদিত শস্যের অভাব নাই, দুর্ভিক্ষ হইলেও দেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে শস্য জন্মায়, তাহা যদি দেশে থাকে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের নিয়ম থাকায় দেশের ফসল দেশে থাকিতে পায় না, অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যায়। দেশজাত ফসল যাহাতে আবশ্যক মত দেশে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা শত চেষ্টা করিলেও গবর্ণমেণ্ট দেশের লোককে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। সম্পাদক।

বাঙ্গালীর জীবনোপায়।

অধুনা অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ক্রমশঃ এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিছুকাল পরে ইহা যে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিবৎসর যে শত শত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় কি? কেমন করিয়া তাঁহারা

সমাজে মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহার স্থীরতা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এখন অনেকেই গবর্ণমেণ্ট অপিসে অথবা অন্য কোন স্থানে দাসত্ব করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু এরূপ অর্থাগমের পথও আর ততদূর সুপ্রসস্থ নাই, অতিরিক্ত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাও ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, কাজেই গভর্ণমেণ্ট আর কেমন করিয়া সকলের অভাব পুরণ করিতে পারেন? ইহাতে গভর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়া অন্যায়। অন্যান্য, ব্যবসায়েও এত লোকসমাবেশ হইয়াছে যে, তাহাতে পুরাতন লোক সকলেরই অর্থাগমের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছে, অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহাতে নুতন ব্রতী যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, সাজ সরঞ্জমের ব্যয় সঙ্কুলিত হওয়াই দুর্ঘট, অর্থ উপার্জ্জন ত পরের কথা। চিকিৎসা, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কার্য্যের বাস্তবিকই এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। আমাদের কয়েকজন কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান বন্ধু উক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নূতন ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু শুনিতে পাই, তাঁহাদের গাড়ী ভাড়ার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন হয় না। এইত অবস্থা, এই ত ইংরাজী শিক্ষার ফল, এত দিন অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া, শরীর মাটী হইল, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল, তাহার পর জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যাপারও ত এই-রূপ। এখন তাহারা খায় কি, যায় কোথায়? শিক্ষকতা কার্য্য এবং সাহিত্য ব্যবসা প্রভৃতি অর্থাগমের কয়েকটী পথ আছে, কিন্তু তাহাতেও প্রতিযোগীসংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সে পথও এক প্রকার রুদ্ধ বলিলে হয়। কলিকাতা-তার অনেক বড় বড় অপিসে এক্ষণে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। রাজকীয় উচ্চ কর্ম্ম সকল আমাদের দেশীয় শিক্ষিত লোকের পাইবার আশা নাই। সৈনিক বিভাগ নৌবিভাগ আমাদের পক্ষে একেবারেই বন্ধ, সুতরাং রাজ সরকারে প্রবেশাধি-কারের পথ, আমাদের পক্ষে অতীব সঙ্কীর্ণ। যদিও আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এ সকল পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে, তাহাতেই বা কত গুলি লোকের অন্নের সংস্থান হইবে? ফলতঃ কর্ম্ম প্রার্থীর সংখ্যা এত অধিক যে, ঐরূপ ব্যবস্থার দ্বারাও অধিকাংশ ব্যক্তির অভাব বিদূরিত হইবে না। অন্যান্য উপায়ের পথে ত কাঁটা পড়িয়াছে, সুতরাং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

মধ্যে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা কিরূপে নিবারিত হয়! এই সকল সমস্যার মীমাংশা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং যিনি এই সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া প্রকৃত উপায়ের পথ উদ্ভাবন করিবেন, তিনিই আমাদের যথার্থ বন্ধু। পূর্ব্বে দেশে বর্ণ বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক জাতির জাতীয় ব্যবসায় ছিল,তাহাতে সকলেই এক প্রকার নির্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তখন আমাদের দেশের লোকের এরূপ কষ্ট, এরূপ দরিদ্রতা ছিল না। তখন কুম্ভকারের পুত্র কুম্ভকারের কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করিত, অন্য ব্যবসায় শিক্ষায় তাহারা বৃথা সময় অতিবাহিত করিত না। কর্ম্মকারের পুত্র স্বব্যবসায়েই প্রবৃত্ত হইত,অন্য ব্যবসায়ে যাইত না, রজকের পুত্র কাপড় কাচিবারই উপায় শিক্ষা করিত, চাকুরী করিতে যাইত না। এইজন্য ব্যবসায়ে এত সুখ ছিল, লোকের অর্থ উপায়ের পথও সুপ্রশস্ত ছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উচ্চ শ্রেণীর সম্মান প[illegible]ত, ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লইয়াই কালাতিপাত করিত। কেবল কায়স্থগণই কতকটা স্বাধীন ব্যবসায়ী ছিল, তথাপি তাহারা কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, চাকরী এবং লেখা পড়া ব্যতীত যে অন্য কিছু করিত, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তখন জাতীয় ব্যবসার এইরূপ আদর ছিল, তাহার কোনরূপ অন্যথা হইত না, অন্যথা করিলে সে সমাজ দ্বারা শাসিত হইত। এক্ষণে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে, পরন্তু বৈদেশিক শিল্প বাণিজ্যে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের একবারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এই হেতু সকল শ্রেণীর লোকের জীবনোপায় সম্বন্ধে এক প্রকার হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে শিক্ষার সম্বন্ধেও অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে উচ্চ শ্রেণীর সন্তানগণের মধ্যেই অতি অল্প লোকে লেখা পড়া শিখিতে পাইত, এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় স্কুল কলেজের অভাব নাই, শিক্ষার্থীও অভাব নাই, শিক্ষারও অভাব নাই। বিকৃত মস্তিষ্ক বাঙ্গালী আপন ব্যবসায় ভুলিয়া, পিতৃ পিতামহের ক্রিয়া কলাপ ছাড়িয়া দিয়া, উচ্চ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইতেছে, এক্ষণে বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সুদূর পল্লীবাসী কৃষকের কুটির পর্য্যন্তও গড়াইয়াছে। ক্রমশঃ।

আলোচনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনী।

৪র্থ বর্ষ। { শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দুর সমাজ বন্ধন।

আজ কাল হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে, সমাজের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে বসিয়াছে। এক্ষণে হিন্দু সমাজের কতক বাধা বাধি নিয়ম থাকিলেও আর কেহ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে না। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, তাহার গতি রোধ করিবার কেহ নাই। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পূর্ব্বে সমাজে মদ্যপায়ীর দণ্ড হইত, অত্যাচারী সমাজ দ্বারা শাসিত হইত, কুকর্ম্মাচারী শাসনের সীমা অতিক্রম করিলে, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইত। এক্ষণে ইংরাজ শাসনে, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আর সমাজের দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না, পরন্তু কেহ কোন কথা বলিলে বা তাহার প্রতিবাদ করিলে, রাজবিধি অনুসারে ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডিত হয়। পূর্ব্বে আমাদের সমাজই সকল বিধি ব্যবস্থার কর্ত্তা ছিল, সমাজে দশজনে যাহা করিত, তাহাই হইত, যাহা না করিত তাহা কোন ক্রমেই হইত না। তখন সমাজে দশের কথার বড় আদর ছিল। তাই আমাদিগের সামান্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য রাজার নিকট ছুটীতে হইত না। এক্ষণে একটী সামান্য বিষয়ের জন্য গোলযোগ হইলে রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ছোট লোকের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় তথাপি আমরা সমাজের আশ্রয় লই

না। অথবা এখন আমাদের সমাজে তাদৃশ বিচক্ষণ, পরার্থপর লোক নাই, যাহার দ্বারা সুফলের আশা করা যায়। এখন যাহাকে আমরা সমাজপতি বলিয়া মানিব, তিনি হয় ত এতদূর স্বার্থপর ও অর্থপিশাচ যে, তাহার দ্বারা যথার্থ বিচার হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্য দশজন বুদ্ধিমান লোকে বিবেচনা করিয়া, এখন একজন মণ্ডল বা মধ্যস্থ সাব্যস্থ করা উচিত, তিনি যেন ধার্ম্মিক এবং সদ্বিবেচক হয়েন, নতুবা তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। কিন্তু এরূপ ধার্ম্মিক পরহিতাকাঙ্খী সদ্বিবেচক লোকের বস্তুতঃই অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর সমাজ বন্ধন একটী বড় ভয়ানক সামগ্রী, অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা ইহার প্রভেদ অনেক। যদিও সকল জাতিরই সমাজ আছে, যদিও মনুষ্য মাত্রেই সমাজ মধ্যে একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি হিন্দু সমাজে ও অন্যান্য সমাজে পার্থক্য যথেষ্ট আছে। সামাজিকতাই সমাজের প্রাণ, সমাজিকতা না থাকিলে সমাজ থাকিতে পারে না, এবং তাহার কোন অর্থই থাকে না। সমাজ ও সামাজিকতা উভয়েই এক বস্তু, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, প্রাণের অভাবে দেহের যে অবস্থা, দেহের অভাবে প্রাণের যে অবস্থা, সেই রূপ সমাজ ও সামাজিকতার মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যিনি যে সমাজে বাস করেন, তাঁহাকে সেই সমাজের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করা, তাহার নিয়মাদি প্রতি পালন করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য, সমাজিকতা অর্থাৎ সমাজ শাসন, সমাজের বিধিবদ্ধ নিয়ম, প্রাণপণে প্রতিপালন করা মনুষ্য মাত্রেই উচিত। আমরা হিন্দু, হিন্দু সমাজের বিধি অনুসারে না চলিলে, ক্রমে সমাজের অবনতি ও নিয়ম সকল লুপ্ত হইয়া যাইবে, সমাজ বন্ধন শিথিল ভাবাপন্ন হইবে। আমরা হিন্দু হইয়া কি রূপে এ সকল দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিব? এখনও আমরা ততদূর অবনত হই নাই, কিন্তু যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন তাহার প্রতি খর দৃষ্টি না রাখিলে ক্রমশঃই অধঃপাতে যাইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সামাজিকতা মানিয়া চলিতে হইবে, সমাজের ক্রিয়া কলাপ, চাল-চলন সমস্ত বজায় রাখিতে হইবে। শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বার ব্রতাদি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। এই সকল নিয়মের অমর্য্যাদা করিয়াই আমরা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িয়াছি, সমাজ মধ্যে নানা প্রকার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা

উপস্থিত হইতেছে ; গৃহ বিবাদ বাড়িতেছে, সমাজ দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে। সকল সমাজেই ক্রিয়া কলাপের ভেদাভেদ আছে, ছোট বড়র প্রতি আদর অভ্যর্থনার তারতম্য আছে, আচার ব্যবহার ও আদান প্রদানের একটা বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে। হিন্দু সমাজেও তাহা চিরকাল ছিল, এখনও আছে, কিন্তু ক্রমশঃ যেন তাহার সম্যক পরিবর্তন হইতেছে। হায়! পূর্ব্বে যখন হিন্দু শাস্ত্রীয় নিয়মের বত্যয় করিত না, পূর্ব্বে যখন হিন্দু ধর্ম্মভাবে, শাস্ত্রের অকাট্য নিয়মের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিত, তখন আমাদের সমাজে, হিন্দুর প্রতি গৃহে কি সুখের উৎসই উদ্ভাষিত হইত? এখন যদি আমরা আমাদের সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারি, তবেই মঙ্গল নতুবা আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দু সমাজের নেতাই ব্রাহ্মণ, ইহার শক্তি ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের সহিত সমাজের মাখামাখি সম্বন্ধ, ধর্ম্মের যাজক ব্রাহ্মণ ইহার মূল শক্তি, সমাজে যাহাতে ব্রাহ্মণের রক্ষা হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণের উন্নতি লাভ হয় এবং যাহাতে সমাজের সকল দোষ তিরোহিত হইতে পারে, হিন্দু আমরা, এই সকল দেখিয়া চলিতে পারিলে, আমরা পুনরায় সেই শান্তি রাজ্যে উপনীত হইতে পারিব, আবার আমরা মনের সুখে হিন্দু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব।

এখনও আমরা সমস্ত হারাই নাই, এখন আমাদের যাহা আছে, তাহা অন্যের নাই।

যদিও কালবশে, আর এই অভাগাদের কর্ম্ম দোষে, হিন্দুর সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, যদিও আজ কাল জ্ঞান-বিজ্ঞান গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত, যদিও আজ কাল অর্থের আদরে সমাজের সমস্ত নিয়মাদি ভঙ্গ হইতেছে, যদিও অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া, ছাই ভস্মের আদর বাড়িয়াছে, মুক্তার অভাবে যদিও শুক্তির আদর হইতেছে, সার ভুলিয়া যদিও অসারে আমরা ভুলিতেছি, তথাপি এ ঘোর দুর্দ্দিনেও আমাদের হিন্দু সমাজ সকলের শ্রেষ্ঠ, ইহার নিয়ম ও বিধি ব্যবস্থা সকলের অনুকরণীয়। যদিও সমস্ত গিয়াছে কেবল মাত্র ঠাট বজায় আছে, তবুও ইহার বুনিয়াদ পাকা, অনন্ত কালের সাক্ষী স্বরূপ ইহা সমভাবেই থাকিবে। কত রাষ্ট্র বিপ্লবে, মুসলমান রাজাগণের ভীষণ অত্যাচারেও ইহার মূলোৎপাটন হয় নাই।

আমাদের অদৃষ্ট ভাল, তাই আমরা এমন পবিত্র সমাজে স্থান পাইয়াছি; হিন্দু সমাজের ভিত্তি অতিশয় পরিপক্ক বলিয়াই আমরা এখন হিন্দু নামে অভিহিত হইতেছি, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি, তাহা না হইলে আমরা এতদিন অহিন্দু যবন মধ্যে পরিগণিত হইতাম, হিন্দু নাম ধরিত্রীর বক্ষঃ হইতে বিলুপ্ত হইত। দুরন্ত কালের নিশ্বাসেও যাহার অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয় নাই, উপর্য্যুপরি নানাবিধ অত্যাচারেও যাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট সংসাধিত হয় নাই, বর্ষায় যাহার পতন, শীতে যাহা সঙ্কোচন ও গ্রীষ্মে যাহা সম্প্রসারিত হয় নাই; চিরকাল যাহা অটল অচল ভাবে সম অবস্থায় অবস্থিত; ভাই হিন্দু! আজ তোমরা কেমন করিয়া সেই সুদুর্লভ সমাজ বন্ধন হেলায় খুলিয়া ফেলিতেছ? কেমন করিয়া তোমাদের আদরের সমাজ ও সামাজিকতাকে অগ্রাহ্য জ্ঞানে অবহেলা করিতেছ? যদি নিজের ভাল চাও, যদি পুনরায় সুখ শান্তির মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সাবধানে পুনরায় সামাজিক রীতি নীতি, বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ কর, অচিরেই তোমাদের মঙ্গল হইবে, এবং হিন্দুর যশঃ সৌরভে চারিদিক পরিপূরিত হইবে। আং সং।

বাঙ্গালীর জীবনোপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যাহাদের কথঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে, তাহারা সকলেই পুত্রবর্গকে লেখা পড়া শিখাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নহি, দেশে বর্ণ নির্ব্বিশেষে যতই প্রকৃত শিক্ষার প্রচার হইবে, ততই যে দেশের উন্নতি হইবে তাহা অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই, আমাদের দেশীয় বালকগণ লেখা পড়া শিখিয়াই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে, অল্পায়াস সাধ্য কার্য্য ভিন্ন অপর কার্য্যে তাহারা মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না। তাহারা পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া একটী বাবু সাজিয়া আপনার পথে আপনিই কণ্টক অর্পণ করিতেছে।

এইত গেল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা, এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বাড়িতেছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাহারা কতক

পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে অথচ প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, সামান্য লেখা পড়া করিতে করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাদের উপায় কি? শিক্ষিতের বরং আশা আছে, কিন্তু ইহাদের আশা কোথায়? ইহারা বেশী পরিশ্রমের কার্য্য করিতেও শেখে নাই,—অথচ উচ্চ শিক্ষিতদের সহিত কার্য্য করিতেও অক্ষম, সুতরাং কোন দিকেই ইহারা কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। শেষে ট্রামওয়ে আফিসে, রেলওয়ে আফিসে কেরাণীগিরি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন দ্বারা এক প্রকারে অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

দারিদ্রের কঠোর পীড়নে, দাসত্বের পেষণে ইহাদিগকে মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া সজীব যন্ত্রবৎ চালিত হইতে দেখা যায়।

জাতীয় অভ্যুদয় লাভের আশা আমাদের বলবতী কিন্তু আমরা দিন দিন যেরূপ দরিদ্রতার অবস্তন প্রদেশে পতিত হইতেছি, তাহাতে আমাদের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি না হইলে কখনই দেশের মঙ্গল হইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিদেশীয় প্রতিযোগীতায় এদেশের বাণিজ্যকার্য্যে সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়াছে। অতএব নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, অভিনব উন্নত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে সুফলের আশা আছে। যেরূপ কল কারখানা স্থাপন করা উচিত, তাহা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, তাহাতে যেরূপ শিক্ষার আবশ্যক তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তবে যদি দেশের ও দেশের উন্নতি হয়। ফলতঃ এ সকলই সময়সাপেক্ষ।

আমাদের দেশে কিন্তু আর একটী বিষয় আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং যাহাতে শিক্ষিত স্বদেশবাসী মাত্রেরই মনোযোগী হওয়া উচিত সেটী কৃষিকার্য্য, আমাদের দেশ কৃষি প্রধান, এখানে কৃষি কার্য্যের যেরূপ সুবিধা আছে অন্য কোন দেশে সেরূপ নাই।

আমাদের দেশে অন্যরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ. ইহার অধিকাংশ স্থান সমুদ্র তীরবর্ত্তী নহে। কিন্তু বিধাতা ইহার গর্ভে যে অনন্ত রত্নরাজী নিহিত রাখিয়াছেন, সেরূপ আর কাহারও ভাগ্যে লেখেন নাই। ভারতের মাটিতে যে সোণা ফলে তাহা সকলেই স্বীকার করিবে! এই স্থানে ঈশপ্ কেথেনের একটী গল্প মনে পড়িতেছে। এক গৃহস্থের কতকগুলি সন্তান

ছিল, বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাহার সন্তানগণকে বলিয়া যায় বাপ সকল! অমুক ক্ষেত্রে গুপ্ত অর্থ পোঁতা রহিল, তোমরা লইও। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তাহারা ক্ষেত্রে গেল এবং কোন স্থানে রত্ন প্রোথিত আছে, জানিতে না পারায় সমস্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ফেলিল তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহাদের ধনের আশা পরিতৃপ্ত হইল না বটে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সে বৎসর যে শস্য জন্মিল তাহাতেই তাহাদের আশাতীত রত্নলাভ হইল। আমরাও স্বদেশবাসীকে বলি, আমাদের দেশে ধনের অভাব নাই, যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কুড়াইতে পারে, সেই বড়লোক হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা যে এত ভাল ছিল, সে কেবল এই জন্য। এক্ষণে আমাদের দেশে যাহারা চাষ করে, তাহারা দরিদ্র, মূর্খ এবং হীনাবস্থাপন্ন, বাস্তবিক তাহারা কিছুই জানে না, এই শ্রেণীর লোক সকলকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই সকল সৎকার্য্যে সহায়তার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন, তিনিই প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী পদবাচ্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে এই রূপকার্যে উৎসাহ প্রদান করিবার লোক সংখ্যা বড়ই বিরল।—কিন্তু ইংলণ্ডে ভদ্রচাষী বলিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, ইহারা স্বাধীন ও সমৃদ্ধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা ও যত্নশীল এবং তদ্বিষয়ে ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। ইংলণ্ডে এইরূপ ভদ্রচাষীর সংখ্যাও অধিক। ইংলণ্ডে যে মধ্যবিত্ত লোক সকল সর্ব্বোচ্চ এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই ভদ্রচাষীগণ তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান সম্প্রদায়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে এই শ্রেণীর লোক অনেক ছিল, এক্ষণে নাই। এইরূপ শ্রেণীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক, এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা ইহা গঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। চাষির দেশ ভারতে কৃষিকার্য্যেই লক্ষ্মীর সমাগম হইবে ইহা শাস্ত্রের কথা, আমরা এক্ষণে কৃষিকার্য্যে বীতস্পৃহ হইয়াই লক্ষ্মী ছাড়া হইয়াছি। কৃষিকার্য্য যে একটী উচ্চ ব্যবসায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। মহা মহা পণ্ডিত ও জগন্মান্য ব্যক্তিগণও এই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বীরচূড়ামণি ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি এবং রোমান ডিকটেটর সিনসিনেটস এই কার্য্য করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছিলেন।

শাস্ত্র বিশারদ, প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি জনকও এই কার্য্য করিতেন, জনকতনয়া সীতার জন্মবৃত্তান্তে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে আবার কবে সেদিন আসিবে, কবে আমরা মহাপুরুষ সিনসিনেটসের ন্যায় হলত্যাগ করিয়া স্বদেশের চিন্তায় মনোনিবেশ করিব, জনকোলাহল হইতে অবসর লইয়া, কবে আমরা মহাত্মা ওয়াশিংটন ও গ্যারিবল্ডির ন্যায় কৃষিচর্য্যা করিতে, স্বহস্ত-রচিত উদ্যান মধ্যে স্বহস্ত-প্রোথিত বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লজ্জিত হইব না। হা, ভগবান! ভারতে কি সে সুখের দিন আবার আসিবে? আবার কি আমরা কৃষিকার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে মনের আনন্দে বিচরণ করিতে অপমান বোধ করিব না? সম্পাদক।

কেন দেখিলাম তারে!

(১)

যমুনা-জীবনে,
সহচরী সনে,
কেন সখি গিয়াছিনু বারি-আনিবারে?
পূরিয়া গাগরি,
আঁখি বারি ধরি,
এনেছি সখিরে কি বলিব তোরে;
কেন সখি গিয়াছিনু যমুনার ধারে,
কেন বা কদম্ব-মূলে দেখিলাম তারে!

(২)

কি যে ঘুম ঘোরে,
দেখিলাম কারে,
কি নেশা ছুটিল সই হৃদয় মাঝারে!
আপনা হারায়,
চরণে বিকায়,
মজিনু সইরে জনমের মত;
দিয়ে মন, দিয়ে প্রাণ, ভেসেছি পাথারে,
কেন সখি হায়! কেন দেখিলাম তারে!

(৩)

নীল উৎপল,
নয়ন যুগল,
অধর বান্ধুলিফুলে কি রাগ সঞ্চারে!
যমুনার ঘাটে,
যেতে যেতে বটে,
কখন ত সই দেখিনি তাহারে,
অচেনায় প্রাণ দিয়ে ভেসেছি পাথারে,
কেন সখি হায় কেন দেখিলাম তারে!

(৪)

পীত ধড়া পরে,
বাঁশী লয়ে করে,
রাধা রাধা ব'লে সই কেন বা ডাকে?
জলদ বরণ,
মদন মোহন,
বাজাইয়ে বাঁশী উদাসী সাজায়,
কালরূপ আলো করে বনফুলহারে,
কেন সখি হায় কেন দেখিলাম তারে!

(৫)

বলে দেলো সই,
মন মোর কই,
হারায়ে এসেছি বুঝি যমুনার ধারে,
ঘরে মন নাই,
কারে যেন চাই,
কি ছাই দেখিনু কদম্বের মূলে,
আপনা হারানু,
মন ফেলে এনু,
কে নিল কুড়ায়ে সই বলেদে আমারে?
কেন সখি হায়! কেন দেখিলাম তারে!

অতিথি।

(১)

আসা যাওয়া জগতের বিচিত্র বিধান।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কভু নহে স্থির
এই আসে দেখা দেয়, আবার চলিয়া যায়
নাহি তৃপ্তি, নাহি শান্তি, নাহিক বিরাম,
নাহি নিদ্রা, নাহি তন্দ্রা, সকলই অধীর॥

(২)

পূরব গগণে রবি উঠে হাসি হাসি
বরষে সোনার কর মনের হরষে,
দেখিতে দেখিতে হায়, সে শোভা ফুরায়ে যায়
ছুটে চলে শিশু রবি দীপ্তি পরকাশি
ডুবিতে পশ্চিমাকাশে গোধূলি পরশে॥

(৩)

কিবা তারা, ধূমকেতু, শীতল সমীর
সবার (ই) এমনি গতি নাহিক নিস্তার,
ছুটে চল্, ছুটে চল্, এই আজ্ঞা ভয়ঙ্কর
ধ্বনিত হতেছে যেন অনন্ত গভীর,
নত শিরে পালে আজ্ঞা এ বিশ্ব-সংসার॥

(৪)

ছুটে নদী কল্‌কলে ফিরিয়া না চায়
ঝর, ঝর সারাদিন ঝরিছে নির্ঝর;
মেঘ হতে মেঘান্তরে, চকিতে চপলা স্ফুরে
হৃদয়ে প্রবল স্রোত বারিনিধি প্রায়
উড়ে যায় বিহঙ্গম কূজি মনোহর॥

(৫)

যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের প্রবল শাসনে
জল, স্থল, শূন্য, ব্যোম কেহ নহে স্থির;
সে বিশ্ব নিয়ম বলে, ক্ষুদ্র নর প্রাণী চলে
ভাসিয়া ভাসিয়া তার জীবন গগণে,
এই বৈতরণী তীরে, এখনি তাহার পারে
কে জানে অশান্ত আত্মা কোথা হবে স্থির!

(৬)

চলেছি নিয়তি স্রোতে নাহিক বিরাম
তাই যদি, কেন রব স্তব্ধ অচেতম?
যেতে যেতে গাহি গান, জুড়াতে আপন প্রাণ
যে শুনে শুনুক নয় ফিরাক বদন
ক্ষুদ্র এ জীবনে কেন ঘৃণা অভিমান?

শ্রীউপেন্দ্রমোহন গুপ্ত। জামালপুর।

ভারতে-দারিদ্র্য।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে লোকের সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ইংরেজদিগের আগমনের পর তাহাদিগের সংসর্গে ও শাসনে ঐ ঐ অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই বিষয় লইয়া সম্প্রতি কিছু বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি ভারত-রাজত্ব হস্তগত করাতে দেশের যে বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। মোগল সাম্রাজ্যের পতন সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের উৎপীড়নে ও বর্গী, পিণ্ডারী প্রভৃতির উপদ্রব দেশ এতই উত্তেজিত হইয়া ছিল যে, তৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ রাজের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত না হইলে, হয়ত ভারতে সভ্যতার চিহ্নও বিলুপ্ত হইত। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের সুশাসনের সময়ে প্রজাবর্গের যেরূপ সুখ সমৃদ্ধি ছিল ইংরাজ শাসনে যে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা কঠিন। বাষ্পীয়-পোত ও বাষ্পীয়-শকটে দুর্গম পথ সুগম করিয়া, লোকের হিত সাধন করিয়াছে সত্য। তাড়িৎবার্ত্তা লোকের বহুবিধ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহাতে দেশের সুখ সমৃদ্ধি কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা তর্কের বিষয়। দুই প্রকারে লোকের পার্থিব হিতসাধন করা যাইতে পারে;—অপরিহার্য্য নিত্য কার্য্যের সেই কার্য্য-সাধন ও নূতন উপভোগের পথ-প্রদর্শন ও উপায় উদ্ভাবন;—বাষ্পীয়-পোত বাষ্পীয়-শকট ইত্যাদি প্রথমোক্তরূপ হিতসাধন কিয়ৎ পরিমাণে না করিয়াছে বলা যায় না; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত রূপই অধিক পরিমাণে করিয়াছে। উপভোগের ইচ্ছার চরিতার্থতা সর্ব্বদাই সুখোৎপাদিকা। কিন্তু উপভোগের ইচ্ছা একটী বিশেষ ভ্রম অনুসরণ করিয়া উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি উদর-চিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত, সুরম্য হর্ম্যে সুবিস্তৃত খট্টোপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন করার ইচ্ছা তাহার মনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইলেও ইচ্ছারূপে নহে, স্বপ্নরূপে মাত্র। কিন্তু উদারন্নের চিন্তাশান্ত হইতে দাও, কিছু অর্থ সংগৃহীত হইতে দাও, ঐরূপ চিন্তা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। তুরঙ্গ

অথবা রুষ রাজ্য লাভ করার ইচ্ছা, বৃটীশ ভারতের ক্ষুদ্র-করদ রাজার মনে উপস্থিত হয় কি না, তিনি জানেন। হইলেও যেরূপ ভাবে হয় তাহাকে আমরা স্বপ্ন নির্ব্বিশেষ চিন্তা বলি,—ইচ্ছা বলি না। কি প্রকারে উদরান্নের সংস্থান হইবে, ইহাই সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটী কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন এই সমস্যার সুমীমাংসা না হইবে, ততদিন বাষ্পীয়-পোত বল,—বাষ্পীয়-শকট বল, তাড়িৎবার্ত্তাই বল, কিছুতেই ভারতের কোন প্রকৃত অভাব দূর করিবে না। সুতরাং কোন প্রকৃত সুখ উৎপাদন করিবে না। অতএব যদি দেখিতে পাই যে হিন্দু মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে জীবিকা-নির্ব্বাহ বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা সুকর ছিল,—যদি দেখিতে পাই যে ঐ সময়ে দেশে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ধন অধিক ছিল, এবং অধিক পরিমাণে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে ছিল, তবে কি প্রকারে স্বীকার করিব যে ইংরাজ শাসনে ও ইংরাজ-সংসর্গে ভারতের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে? কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়,—কৃষি দ্বারা উৎপন্ন ও বাণিজ্য দ্বারা দেশান্তর হইতে দ্রব্যাদি আনীত হয়। বাণিজ্য দ্বারা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা ভারতের অদৃষ্ট লিপিতে লিখিত হয় নাই। সুতরাং কৃষিই অর্থাগমের প্রকৃষ্ট ও একমাত্র উপায়।

চিরকালই কৃষিদ্বারা ভারতের ঐশ্বর্য্য; চিরকালই ভারত কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ভারত এখন নিঃস্ব হইল কি প্রকারে? ভারতে কৃষির কি পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতি ঘটিয়াছে? কৃষি জমির পরিমাণের সহিত লোক সংখ্যার অনুপাত বাড়িয়াছে কি, কমিয়াছে তাহা পরে দেখিব। কৃষিবিদ্যার পূর্ব্বোপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে, কি অবনতি হইয়াছে, তাহাও পরে বিবেচনা করিব। সম্প্রতি দেখিতেছি দেশ যেরূপে শাসিত হইতে, তাহাতে দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে কৃষকেরা নিজ পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পারিত। ভূমিকর্ষণ দ্বারা যে শস্য উৎপাদিত হইত, তদ্দ্বারা রাজস্ব পরিশোধিত হইয়া স্বচ্ছন্দে কৃষকের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। এখন কৃষক রাজস্বের জন্যই ভূমি-কর্ষণ করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতে যে অল্পাংশে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষকের কর-ভার এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কোনও কোনও স্থানে রাজস্ব পরিশোধ ও

কৃষিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কৃষির উপস্বত্বের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা কৃষকের উদরান্ন ও চলে না। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব-কালে দেশে যে অর্থ উৎপন্ন হইত, দেশেই তাহা ব্যয়িত হইত। দুরন্ত "হোম চার্জ্জ" কৃষকের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সুদূর ইংলণ্ডে নিক্ষেপ করিত না। সুদানের যুদ্ধ সজ্জার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য ভারতের ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইত না। রাজার রাজত্ব নির্বিশেষে উচ্চ-বেতন ভোগী বিদেশবাসী রাজকর্ম্মচারীগণ ভারতের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া, তাহা স্বদেশে ভোগ করিবার জন্য ভারত হইতে বিদায় লইত না। হিন্দু ও মুসলমান রাজারা দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারাই রাজকর্ম্ম চালাইতেন,—দেশীয় শিল্পোৎপাদিত বস্তু দ্বারাই রাজ্য শাসন ও জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্পর্কীয় অধিকাংশ ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ ভূমিকর্ষণ দ্বারা উপার্জ্জিত প্রজার ধনের যে অংশ রাজস্ব স্বরূপ রাজকোষে গমন করিত, তাহাও প্রকারান্তরে প্রজার মধ্যেই বিতরিত হইত। হয়ত কেহ বলিবেন যে কেবল ধন থাকিলে কি হইবে? তাহা দস্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে সুরক্ষিত হওয়া চাই;—তাহা উপভোগ করিবার সুবিধা চাই। যদি দেশ সুশাসিত না হয়, যদি শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ না হয়, তবে অর্থ কেবল অনর্থ মাত্র। কথাটী সত্য। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে কি প্রজাবর্গের শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না? পিণ্ডারী ও বর্গীর উৎপাৎ চিরকাল ছিল না। মেগাস্থিনিসের সময় হইতে ভারতবাসীর যত বৈদেশিক ইতিবৃত্ত পাওয়াগিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ভারতবাসীরা স্বদেশীয় রাজাদিগের শাসনে সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে ছিল। মেগাস্থিনিস বলেন তৎকালে হিন্দুদিগের মধ্যে চৌর্য্য ছিল না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছিল না। তবে দেখা যাইতেছে যে ইংরাজ শাসনে ভারতের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় নাই, জীবিকা-নির্ব্বাহ সৌকর্য্য-জনিত সুখও বৃদ্ধি হয় নাই;—পরন্তু উভয়েরই অবনতি ঘটিয়াছে।

তবে ইংরাজের সংসর্গ ও শাসন হইতে আমরা কিরূপ ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজ শাসনভার গ্রহণ করাতে দেশ ধ্রুব অধঃপাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। ভারতবাসীগণ "সুজল সুফল শস্য শ্যামল" বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে সুখে কালযাপন করিতেছিল, হঠাৎ চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া

পড়িল। সেই সময়ে নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়া থাকিলে হয়ত প্রবল-প্রলয়-বারিতে তাহারা ভাসিয়া যাইত; কিন্তু ইংরাজ জাতি আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল। রক্ষা করিল বটে,—কিন্তু তাহার ফল কি হইল? সেই শ্যামল সমতল ক্ষেত্র হইতে একটী মনোজ্ঞ পথ তাহাদিগকে একটী পর্ব্বতের উপরে লইয়া চলিল। পথের দুইদিকে মনোহর আপন শ্রেণী। ইংরাজজাতি তাহাতে ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত। ভারতবাসী প্রলয়-বারি হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনের সুখে চলিতেছে, আর দুই পার্শ্বস্থ মনোহারী আপন শ্রেণীর শোভা-সন্দর্শন করিতেছে। উপরের দিকে যতই যাইতেছে, ততই বলক্ষয় হইতেছে। আর চলিতে পারে না, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফে দেশের সুখ স্বচ্ছন্দ বাড়িয়াছে, দেশ অধিকতর সভ্য হইয়াছে; কিন্তু এইরূপে দেশ যতই সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে, ততই দেশের বলক্ষয় হইতেছে, দেশ দরিদ্র হইতেছে, দুর্ব্বল হইতেছে। সভ্যতার ও সুখ স্বচ্ছন্দতার উপাদানের জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে টাকা ঋণ করিয়াছে, তাহার সুদ চালাইতেছে, ভারত ক্রমে হীনবল হইতেছে। কেহ বলিতে পারেন যে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ না থাকিলে এই বৃহৎ রাজ্যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইত এবং লোকের যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হইত। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য। ভারত গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, এ দেশের লোকের রুচি ও অভ্যাস যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, আধুনিক সামাজিক জীবন যেরূপ জটিলতা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এ দেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ আর বিলাসের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সভ্যতার সমস্ত আয়োজনই আজ ভারতে অত্যাবশ্যক; কারণ ভারত আধুনিক সভ্যতার সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। এই সোপানে ভারত স্বয়ং আরোহণ করিতেছে না; আরোহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ভারত শক্তিহীন, উপায়হীন, উদ্যমহীন। ইংরাজ ভারতকে এই সোপানে টানিয়া তুলিতেছেন, এবং এইরূপে উদ্গমনে ভারতের যে ক্লান্তি জন্মিতেছে, তাহাতেই ভারত ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে, ফলতঃ যাহাকে আধুনিক সভ্যতা বলে তাহা ভারত-বর্ষীয়ের ন্যায় নিঃস্ব ও দুর্ব্বলজাতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয়ের ন্যায় জাতি এই সভ্যতার সোপানে স্বয়ং আরোহণ

করিতে পারে না; কেহ আরোহণ করিয়া দিলেও নিরাশ্রয়ে স্থির থাকিতে পারে না। অদম্য অধ্যবসায়, সাহস ও সংকল্প এই সভ্যতার ভিত্তি, অজস্র অর্থ ও অর্থাগমের উপায় এই সভ্যতার আশ্রয়স্তম্ভ। ভারত তাস লইয়া সভ্য ইংরাজের সহিত ডাক খেলিতে বসিয়াছে;—ইংরাজ ডাকিতে ডাকিতে ভারতকে কুরুশ করিয়াছে;—এখন ভারতে যাহা পাইতেছে, ইংরাজ তাহা হস্তগত করিয়া ভারতকে ইচ্ছামত যে কয়েকখানা তাস বাছিয়া দিতেছেন তাহা লইয়াই ভারত খেলিতেছে। এ খেলাতে ভারতের স্বার্থ নাই; স্বার্থ কেবল ইংরাজের। সুতরাং ভারতে দারিদ্র অবশ্যম্ভাবী। শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম।

শ্মশানে।

(উদ্ভ্রান্ত।)

"The srme fond mother bent at night
"Our each fair sleeping qrow ,
She had each folded flower in sight
Where are those dreamers now ?

দূর—দূর—বহুদূর হইতে আসিয়াছি। সঙ্গে আর একজন আছে। আমি যাইব না—সঙ্গের লোককে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি। শ্মশান বুঝি অনন্তে যাইবার ষ্টেশন (Station)! ইনি একজন অনন্তে যাইবার যাত্রী। আমি ইঁহাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছি। আমাকে পাগল বলিও না। এই যাহা ছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার অস্তিত্ব একবারেই নাই, ইহা কেমন করিয়া বলিব? বলিতে যে প্রাণ কেমন করে—চিন্তার কূল থাকে না; তবে কেমন করিয়া বলিব, নাই! তাই বলিতেছি, ইনি অনন্তে চলিয়া যাইতেছেন। আমি ইঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছি। অনন্তের পথও যে অনন্ত; আহা! ইনি হাঁটিয়া যাইবেন কেমন করিয়া? তাই গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছি। আবার আমাকে পাগল বল কেন? কি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?—"গাড়ী কোথায়?" কেন দেখিতেছ না কি? ঐ যে তোমরা যাহাকে চিতা বল—আমি উহাকেই গাড়ী বলি। তোমরা যাহাকে আগুন বল—আমি উহাকেই চালক বা ড্রাইভার (Driver) বলি। যাত্রী ও ড্রাইভার অন্তর্দ্ধান হইলে যে

গুলা পড়িয়া থাকে তাহাকে তোমরা অন্ধকার ও চিতাভস্মস্তূপ বল, আর আমি উহাকে বলি গাড়ীর আবর্জ্জনা। তোমরা যাহা বলিয়া বুঝ, বুঝিও—আর আমি যাহা বুঝি তাই বুঝিব। তবে আমাকে পাগল বলিবে কেন? বল তাহাতে ক্ষতি নাই;—পাগলের প্রলাপ না শুন তাহাতে পাগলের ক্ষতি লাভ কি? পাগলের কথা পাগলেই শুনে। যদি পাগল হও ত আমার ইতিহাস শুন। পিতা একদিন আমাকে জগতের হাটে ডাকিয়া আনেন। সেই অবধি আমি জগতের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ব্যবসায়ের কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। স্বাস্ত বুঝি নাই, তাহার কারণ আমি জগৎকে চিনিতে না চিনিতেই পিতার ডাক পড়িল। পিতা আমাকে অজ্ঞ অবস্থায় রাখিয়াই অনন্তে চলিয়া গেলেন। তারপর পিতার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আমার সহস্র ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতি স্বার্থপর সকলে আমার স্বার্থ না বুঝিয়া চলিয়া গে[ল]। আমাকে তাহারা মূলধন স্বরূপ কি দিয়া গেল, জান? তাহারা দিয়া গিয়[াছে] একটা ব্যথা, আর অশ্রু! কি করি, মাতা এখনও জীবিত—তাই মাতা-পু[ত্রে] সেই মূলধনের একটা ব্যবসা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। মূলধনের নাকি দা[ম] বড় বেশী! তাই ব্যথাটা বুকে ও অশ্রুকে চক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছি। দুই পিতৃব্যছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার একজন চলিয়া যাইতেছেন। তাই তাঁহাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছি। এখন ভাবিতেছি মূলধন ত অনেক দরেরই ছিল; কিন্তু তাহা লইয়া ব্যবসা করিলাম কি? বুকটা খুলিয়া দেখি! হরি! হরি! মূলধন এত বাড়িয়া গিয়াছে? জিনিষের ব্যবসায় শিখিলাম না—খালি এ মূলধনের তেজারতি করিয়া কি হইবে? ভাল কথা, হরিনাম কিনিয়া তাহার ব্যবসা করিলে হয় না! হরিনাম বড় মধুর ফল! কেন মিছামিছি মূলধনের বোঝা বাড়াইয়া গাধার মত বোঝা লইয়া কষ্ট ও যাতনা ভোগ করি? হরিনাম কিনিলে মূলধন কমিবে; সুতরাং বোঝাও কমিবে। কেন মূলধনের ভারে বুকটা ঝাঁঝরা করিয়া ফেলি? জগতের হাটে বসিয়া একটা হরিনামের দোকান খুলি না কেন? স্বাদ-গ্রহণ করাও চলিবে, আর ব্যবসাও চলিবে। আমার আহার-ঔষধ দুই হইবে। বুদ্ধিমান লোকে যেমন রথও দেখে এবং কদলীও বিক্রয় করে, আমি সেমনিই করিব। পিতৃব্যকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ঐ ব্যবসা করাই যুক্তি সঙ্গত।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

যৌবনে-যোগিনী। *

শ্মশান-কানন-কুঞ্জে ক্ষীণালোক-ভাতি
দূর [illegible] নিশীথের আঁধার-দীনতা,
[illegible] মৃণ্ময় বেদী-যোগী-যোগাসন ;
তাহা যেন বিজড়িত কত পবিত্রতা।

সেই [illegible]ত বেদীপরে মৃগচর্ম্ম রাখা,
[illegible]রি বস্ত্রখণ্ড শুভ্র মনোরম,
তা[illegible] দেখি একি ছবি, প্রকৃতির পটে,
অম[illegible] মূরতি যেন দেবী অনুপম !

[illegible] কণ্টকিত কায়, শিহরে শরীর,
দে[illegible]রূপ-রাশি-মাঝে স্ফুরিছে দামিনী ;
আ[illegible] নিমীলিত আঁখি যোগ-নিমগনা,
[illegible] গো যৌবন ভরা স্বরগ-ভাবিনী !

[illegible]-সুখ যেন মিলা'য়ে যতনে,
সংসার-তরঙ্গ-প্রান্তে ত্রিতাপ-হারিণী,
[illegible] হৃদয়ে ল'য়ে দাঁড়া'য়ে কৌতুকে ;
[illegible] গো মাধুরীভরা যৌবনে-যোগিনী !

শিথীল কুন্তল রাশি, বসিয়ে নীরবে,
ব্রহ্মপদ অরচনে অনন্ত পরাণ,
এযে সতী রূপবতী বাঙ্গালী-রমণী ;
স্বরগ-অমৃত ভরা হৃদয় মহান।

এ দৃশ্য ত্রিদিব-তরে ; এরূপ-মাধুরী-
এ অমৃত-ভাব-রাশি নিরখি' নয়নে,
শত মহাযোগী লভি' চির-প্রেমালো[illegible]
ছুটে সে অনন্ত-পথে চিন্ময়-চরণে।

ত্রয়োদশ বর্ষে দিয়ে সুচির বিদায়,
স্বামীধনে ক্ষুণ্নমনে অশ্রু বিসর্জ্জিয়া,
আজি এ যৌবনে মাতা হৃদয় সম্পদে,
যোগীর আশ্রম-মাঝে "ভবানী সইয়া।"[১]

জগৎ-সংসার-মাঝে শত অন্বেষিয়া,
(জ্যোতির্ম্ময়ী প্রেমরূপে পাতক নাশিনী)
কোথা' কত মিলে হেন "ভবানী সইয়া"
কোথাবা মিলেগো হেন যৌবনে-যোগিনী।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

---

* মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "ভারতী" পত্রিকায় "বাম রাজায় মুলুক" শীর্ষক ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে যুবতী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারিণীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহারই আভাস অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত। ইনি একাদশ বর্ষে বিবাহিতা হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষে বিধবা হন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় "ভবানী সইয়া" বা "ভবানী মাতা"।

(১) "ভবানী সইয়া"—"ভবানী মাতা।"

মা।

জননী গিয়াছে চ'লে নিভেছে সকল,
অন্তরের সাধ হাসি সকলি নিষ্ফল ;
গেছে সুখ, গেছে শান্তি, চ'লে গেছে আশা,
আছে মাত্র স্মৃতিটুকু আর ভালবাসা,
আর আছে জ্বালাময়ী দুঃখের বারতা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে দৃঢ়তর গাঁথা।
প্রতিমা নাহিক আর, গেছে পূর্ণ ঘট,
তার বিনিময়ে আছে ছায়া-চিত্র পট ;
তাই বুঝি মাঝে মাঝে দেখা দাও এ[illegible]
তাই বুঝি অলক্ষিতে বুক যায় ভেসে।
তুমি ত গিয়াছ চলে, নিয়ে গেছে স[illegible]
আছে কি মা, সেই দেশে এ শোক-বিভব?
দয়াময়ী, প্রীতিময়ী, শান্তিময়ী মা[illegible]তা!
পশে কি শ্রবণে তব এ দুখ বার[illegible]?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বালী।

মাসিক সংবাদ।

[illegible]তা। পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [illegible] জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক আগষ্টাইন নামক জনৈক ফিরিঙ্গীর হস্তে নিহত হই[illegible]ন। ট্রাম গাড়ীতে সামান্য বচসা হইয়াই উভয়ে কলহ উপস্থিত হয় ; ফিরি[illegible] পুঙ্গব নাকি একটী ঘুসি মারেন, সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয় ; পরীক্ষায় জানা গিয়াছে—ফুসফুসের দোষেই শরৎ মারা গিয়াছে। বিচারে, কেবল শান্তি-ভঙ্গের জন্য আগষ্টাইনের ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

ক্রটী স্বীকার। গতবারের আলোচনায় "উপহার" শীর্ষক কবিতাটীর নিম্নে একটী "ফুটনোট" ভুল হইয়াছিল, এবার তাহা দেওয়া গেল। সাহিত্য, ভারতী, পুণ্য, পূর্ণিমা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় লেখক এবং আলোচনার সহকারী সম্পাদক, সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বাল্যসখা শ্রীযুক্ত বাবু কালী-দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্দেশে উক্ত উপহার কবিতাটী রচিত।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ। } পৌষ, ১৩০৭ সাল। { নবম সংখ্যা।

কীয় মন্তব্য।

নার সহকারী সম্পাদক বাবু কালিদাস চক্রবর্ত্তী
ত ৫ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতঃকালে করাল কৃতান্ত
ভাসাইয়া অকালে কালিদাসের প্রাণবায়ু অপ-
অনুমান ত্রিশবৎসর হইয়াছিল, কিন্তু এই
বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।
ায় এমন সাময়িক পত্র নাই, যাহাতে কালি-
। তাহার অকাল মৃত্যুতে আলোচনা বাস্তবিকই

—এবার লাহোরে জাতীয় মহা সমিতির ষোড়শ
ছল, সভাপতি ছিলেন—মাননীয় মিঃ চন্দ্রাবরকর;
নেক গণ্যমান্য লোক একত্রিত হইয়াছেন, ইহা বড়ই
তে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের শিক্ষিত গণ্যমান্য
ইয়া ভারতবাসীর দুঃখাপনোদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা
বিষয় আর কি হইতে পারে, কিন্তু সময়ে সময়ে গৃহ বিচ্ছেদেই
য়া যায়, ইহা যে যারপরনাই পরিতাপের বিষয়, আর এইজন্যত
ালি! অগ্রে পাঁচজনে একসঙ্গে থাকিতে শিক্ষা কর, তার পর
হইও, নতুবা শত্রু হাসাইয়া ফল কি?

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ শোচ-
নীয় ভাব ধারণ করিতেছে,—দুই এক বৎসর অন্তর দেশে যেরূপ দুর্ভিক্ষের
প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ইহার একটা আশু প্রতিকার না হইলে
অন্নগত প্রাণ ভারতবাসীর আর কিছুতেই নিস্তার নাই; কিন্তু এ কথা কাহা-
কেই বা বলি, আর শুনেই বা কে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অতিবৃষ্টি
বা অনাবৃষ্টিতে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে—বিধাতা আমাদের প্রতি বৈমুখ, তিনি
আমাদের প্রতি নিদয় হইয়াছেন বলিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা; তিনি যে কেন
আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, ইহার উত্তর আর কিছুই নয়—কেবল আমা-
দের নিজের দোষ, নিজের দোষেই আমাদের এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিতেছে;
আমরা কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছি, স্বদেশের [illegible] কিছুমাত্র
মায়া বা ভক্তি নাই। দেশের উন্নতির বিষয়ে অ[illegible]
দেশের গণ্যমান্য, যাঁহাদের উপর সমাজের ভবি[illegible]
রাই কেবল আপনার লইয়া ব্যস্ত; দেশের বাণিজ্য[illegible]
গম হইবে, সেই পথই ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাইতে[illegible]
মান্য ব্যক্তি কাহার দৃষ্টি আছে কি? [illegible]
আকর্ষিত হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতি[illegible]

অহঙ্কারে পতন—জর্ম্মণ সম্রাটের ক্ষৌরকা[illegible]
সময় জিজ্ঞাসা করে যে, "হুজুর! চীন সম্বন্ধে [illegible]
এই বিয়াদবীতে সম্রাট সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তা[illegible]
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। উক্ত ক্ষৌরকারের [illegible]
হইয়াছিল; সে প্রত্যহই লোকসমাজে অহঙ্কার করিয়া[illegible]
হাত ধরা, তাঁহার সহিত আমার কত কথাবার্ত্তা হয় [illegible]
রোজগারও করিত,—সম্রাট ঐ সকল বিষয় জানিতে পারি[illegible]
করিয়াছেন? অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইলে প্রায়ই এইরূপ [illegible]
বলে—"নাহঙ্কারাৎ পরঃ রিপুঃ।"

সিটি থিয়েটার—আমরা বিগত রবিবার কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে [illegible]
অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম; উক্ত দিবসে "কৃপণের ধন" [illegible]
অভিনয় হইয়াছিল। সিটি থিয়েটারের [illegible]

বৎসর অস্থায়ীরূপে নানা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া অভিনয় কার্য্যে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন। আমরা সেদিনকার অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; পোষাক পরিচ্ছদ দৃশ্যপটগুলি সমস্তই নূতন; অন্যান্য থিয়েটার অপেক্ষা ইহারা কোনও অংশে ন্যূন নহেন, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা প্রীত হইয়াছি,—নীলমাধব বাবু শুধু ম্যানেজার নহেন, একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতাও বটেন।

ভারতে কৃষি।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষিকার্য্যই ইহার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এক্ষণে আমাদের সেই কৃষিকার্য্যে আস্থা আর নাই বলিয়া, দিন দিন এত দুর্গতি হইতেছি, প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ-দাবানলে দগ্ধ হইয়া দেহ জর জর করিতেছে।

কৃষিকার্য্যের মত জীবিকার্জ্জনের পবিত্র নির্দ্দোষ উপায় আর নাই। সহজে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে তাহার পন্থা একমাত্র কৃষি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাই আমাদের মহামান্য আর্য্যঋষিগণ কৃষি কার্য্যকেই ভারতবাসীর উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই মহাজন-বাক্য আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তথাপি শঠের শঠতায়, জুয়াচোরের জুয়াচুরিতে এখন প্রায় সকল ব্যবসায় বাণিজ্যই উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে, কোন ব্যবসায় আর তাদৃশ সুখ নাই। কেবল একমাত্র কৃষিকার্য্যই এখন ঠিক সমভাবেই আছে; এখনও এই দুরন্ত কলিকালেও তাহাতে শঠতা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কোনরূপ কলঙ্ক প্রবেশ করে নাই।

ভারতবাসী চিরকালই কৃষিজীবী ছিল; চিরকালই তাহারা কৃষি কার্য্যকে আপনাদের উন্নতির সোপান বলিয়া জানিত, কৃষি কর্ম্মই যে ভারতের ধন, প্রাণ ও মান, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কে না বলিবে, ভারত কৃষি কার্য্যের জন্য চির প্রসিদ্ধ? এখন সেই কৃষি কার্য্যেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ কিরূপ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহা ভাবিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এখন আমরা মহা সভ্য হইয়াছি, সমাজে মাননীয় হইতে শিখিয়াছি, তাই এখন আর এই পবিত্র কার্য্যে আমাদের মনঃ সংযোগ হয় না। মানী আমরা

মান লইয়াই ব্যস্ত, পাছে কৃষি কার্য্য করিলে আমাদের মান যায়, পাছে চাষ করিলে চাষা বলিয়া সভ্যসমাজে আমাদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দেয়, এই ভয়েই আমরা বিব্রত, এইজন্যই আমরা চাষের কাজকে ছোট লোকের কাজ বলিয়া ঘৃণা করি; এইজন্যই আমরা চাষিবাসী কৃষককে "চাষা" বলিয়া ঘৃণা সূচক বাক্যে তাহাদের প্রাণে বাক্যবাণ বিদ্ধ করি এবং তাহারা কাছে বসিলে অমানুষিক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিকট হইতে তাড়াইয়া দিই। ইহাই আমাদের সভ্যতার চরমোৎকর্ষ, ইহাই আমাদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

কৃষিকার্য্য করিলে মান কমে, না মান বাড়ে। এখন একজন কৃষকের যেরূপ মান আছে, বোধ হয় একশত টাকা মাহিনার চাকু[illegible] তাহার নিকট হার মানিতে হয়। তবে কৃষকের বাহাড়ম্বর নাই, কি[illegible] চাকুরের বাহাড়ম্বরে তুমি চমকিত হইবে; কিছু থাক আর নাই থাক, [illegible] পরিচ্ছদ দেখিলেই তুমি মোহিত হইয়া তাহাকে মান্যগণ্য বড়লোক [illegible] বাধ্য হইবে, ইহাই এখন সভ্য সমাজের রীতি।

এখন কৃষকগণের যেরূপ পবিত্র হৃদয়; এখন তাহারা যেরূপ সুখ[illegible] অনুভব করে, অনেক ধনী বড়লোকের গৃহেও তাহার তিলার্দ্ধ দেখি[illegible] যায় না। এখন কৃষকগণের মধ্যে হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ যাহা আছে, [illegible] সভ্য সমাজে তাহার কণা মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন [illegible] অর্দ্ধরাত্রে গৃহে অতিথি আগমন করিলে, শশব্যস্তে তাহার আদর [illegible] করে, গভীর রাত্রেও তাহারা যে কয় জনই হউক না, চাষে চাল, চাষে[illegible] [illegible]রি-তরকারী ও গৃহে গোদুগ্ধ দিয়া তাহাদের পরিতুষ্টি সাধন করে, [illegible]পন করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, অম্লান বদনে থাকিবার স্থান দান [illegible] এবং সমস্ত রাত্রি তাহাদের সেবা করিবার জন্য কুণ্ঠিতভাবে জাগিয়া থ[illegible]ক, শিক্ষিত সভ্য সমাজে কয়জন এরূপ ভাবে অতিথি সৎকার করেন? তাঁহাদের সিংহদ্বারে যাইলে ত প্রথমেই দ্বারবানের অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিতাড়িত হইতে হইবে, তবে বাবুর নিকট আশ্রয়-লাভের আশা কোথায়? তাই বলিতেছিলাম কৃষকগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক পবিত্র ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অতএব কৃষিকার্য্যের তুল্য পবিত্র ব্যবসা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে এই কৃষিকার্য্যে যাহাতে উন্নতি হয়, আমাদের স্বতঃপরতঃ সেই চেষ্টা করা উচিত, প্রাণপণে কৃষি কর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আরও ধরিতে গেলে কৃষি প্রধান শব্দটী আমাদের দেশে যতদূর

প্রযুজ্য, আর কোন দেশে ততদূর নহে। বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে কৃষি কার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা, তাহার কারণ খনিজ পদার্থ অন্য দেশের তুলনায় এদেশে অতি অল্পই আছে, ইহার অতি অল্পাংশই সমুদ্র তীরবর্ত্তী ;—যে টুকুও বা আছে, তাহাও বন্দরের অনুপযোগী, সুতরাং এদেশে বাণিজ্যের আদৌ সুবিধা নাই। তবে ভগবান ইহাকে যে অতুলনীয় শক্তি দিয়াছেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে লেখেন নাই, ইহার উৎপাদিকা শক্তি সকল দেশ অপেক্ষা অধিক। অতএব এখানে সেই শক্তি অনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে সকলেই কিছু না কিছু জমির চাষ রাখিত, তাহাতে ৎসরের অন্ন সংস্থান হইত ; গৃহিণীগণ অবসর ক্রমে বাটীর নিকট পতিত সুব... শাক সবুজী বসাইয়া গৃহস্থের কথঞ্চিৎ সাশ্রয় করিতেন, এখন তাঁহানি... তাঁদের ন্যায় সভ্য হইয়াছেন, কৃষির দেশে কৃষিকার্য্যও একরূপ উৎসন্ন হই... বসিয়াছে।

...ক্ষিত এবং সভ্য হইলেই যে কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহার কোন কার... ই। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং আর্য্য সমাজেও ইহার যথেষ্ট আদর এখনও বর্ত্তম... আছে, আর আর্য্য শব্দের ধাত্বর্থ বলিলেও কৃষিজীবী বলিয়া মানিতে হয়। ...দিন মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সময়ে সভাপতি মাননীয় ...ন সাহেব মহোদয়ও একথা সপ্রমাণ করিতে গিয়া অনেক শাস্ত্রীয় ক... উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন "কৃষক সমাজই সকল সমাজের পরিপো... ও রক্ষক, কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া দিলে এই জগত হইতে মনুষ্য নাম লোপ হইত, কৃষকের লাঙ্গল যে ছায়া দান করে, কত রাজার রাজচ্ছত্রকেও তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ছায়া লাভ করিতে হয়। ইংলণ্ডে ভদ্রচাষী বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইহাঁরা সমাজের মধ্যে বিশেষ মান্য গণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ইংলণ্ডে যে সকল মধ্যবিত্ত লোক এক্ষণে বিশেষ মান্যগণ্য ও ক্ষমতাশালী বলিয়া বর্ণিত হয়, এই চাষীই তাহার মধ্যে একটী প্রধান অংশ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাহার গৃহে "গোলাপোরা ধান" থাকিত, তাঁহাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমান বলা হইত।

কৃষিকার্য্য একটী উচ্চ বৃত্তি ; ইহার শ্রেষ্ঠতা ও পবিত্রতা হিন্দু বিশেষরূপে অবগত আছেন। নূতন ধান্য গোলাজাত করিয়া এখনও হিন্দু কৃষি পূজা করে। কৃষি কার্য্যের আদর কোন্ দেশে নাই ? আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, এবং ইউ-

রোপীয় যাবতীয় উপনিবেশে চাষের আদর। রোমান ডিক্টেটর সিনসিনেটস, বীরবর ওয়াশিংটন ও গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি মহাত্মগণও কৃষিকার্য্য করিতেন; তবে এক্ষণে আমরা হিন্দু হইয়া কেন আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষি কার্য্যের প্রতি ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেছি? ভাই হিন্দু! আর কেন, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আইস কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করি। তোমরা শিক্ষিত হইয়াছ, আইস বৈজ্ঞানিক উপায়ে কল প্রস্তুত করিয়া, কৃষি কার্য্যের উন্নতি-সাধনে প্রাণপণ করি। আজ দেখ, অন্নাভাবে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; অজন্মা হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ দাবানল হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! আর কি নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত? যদি এই হাহাকার নিবারণ করিতে চাও, যদি দেশে শান্তি স্থাপন করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে দৃঢ়ব্র[illegible] হও, মনে স্ফূর্তি পাইবে, হৃদয় শান্তিময় হইবে; পরন্ত অন্নের জন্য আ[illegible] হা[illegible]কার করিতে হইবে না, অচিরেই দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া দে[illegible] প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

আমরা বারান্তরে কৃষি শিক্ষার বিষয় কিছু কিছু বলিব।

আদরিণী গৃহিণী।

সুর—"তাই ভাবি গো মনে" গানের অনুরূপ।

কেন্ কেল্‌তে গিয়ে, কি জানি দেখিয়ে,
এনেছে ডরায়ে বউ মা তোমার।
তাই বলি গো মা, কর তারে ক্ষমা,
আজ থেকে রাঁধতে পার্‌বে না সে আর॥
তুমি আর দিদি, দুই বেলা যদি,
রাঁধ, তবে প্রাণ বাঁচিবে তাহার।
নহিলে আমার, বারশ টাকার,
তোড়াটী বুঝি বা ডোবে মা এবার॥
যখন তাহারে, এনেছিনু ঘরে,
দেখিতে যেমন মা দুর্গা আকার;

সিংহ এনে দিলে, অসুর সাজিলে,
কত লোকে পূজা করিত তাহার।
হাতা কড়া বেড়ী, গোবরের নুড়ী,
ধরিয়ে প্রতিমা হয়েছে অপার।
হে গর্ভধারিণি! শোন মোর বাণী,
আজ হ'তে তারে রাঁধাওনা আর॥
ও কর-কমল, আরক্ত কোমল,
উল্ সুতোয় শুধু হয় গো বাহার।
চেয়ারেতে হেলে, এলাইয়ে চুলে,
নভেল পড়িবে বাঁকাইয়ে ঘাড়॥
পাউডার মুখে, বডী এঁটে বুকে,
ব্লুম দিবে ঠোঁটে, গায়ে ল্যাভেণ্ডার।
বম্বে শাড়ী পরি, মাথায় 'ফেশান' করি,
'ডবল টাকা' খোঁপা শোভিবে তাহার॥
এ যদি না হয়, জানিও নিশ্চয়,
বাবার সনে তোমায় দিব পরিবার।
'রেকর্ড' কিছু নাই, শুধু শুনতে পাই,
দশ মাস ছিনু উদরে তোমার;
চৌরঙ্গীর বাড়ী, একটী কুঠরী,
ভাড়া নিতে যাহা লাগিত আমার।
হিসাব করিয়ে, দিব তা ফেলিয়ে,
সুদ কিছু দিব সঙ্গেতে তাহার।
লোকে বলে সবে, আমায় শৈশবে,
পালিয়াছ তুমি ধাত্রীর আকার।
মাহিনা তাহার, দিব মা এবার,
কোন চিন্তা তুমি করো না গো আর॥

জীবনের হাসি।

১

আবার চন্দ্রমা হাসিবে গগনে,
আবার কুসুম ফুটিবে কাননে,
বিশাল ধরণী হাসিবে আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

২

আবার কুমুদ হাসিবে সলিলে,
প্রভাতে সরোজ পবন হিল্লোলে—
হাসিয়া মাতাবে তপনে আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৩

কুহরি কোয়েলা পঞ্চমে আবার,—
হাসিয়া মাতা'বে কানন কান্তার,
ঝঙ্কারি ভ্রমরা হাসিবে আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৪

আবার বসন্তে ভুবন হাসিবে,
ফুটিয়া কুসুম সৌরভ ছুটিবে,
হাসিতে ফুলের হাসিবে সংসার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৫

মঞ্জু নিকুঞ্জে পাপিয়া বঁধুয়া,—
গাহিবে আবার হাসিয়া হাসিয়া,
হাসিবে নিকুঞ্জ সঙ্গীতে তাহার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৬

নীরব নিশীথে বাজিলে বাঁশরী,
ছুটিবে সে স্বরে মধুর মাধুরী,
হাসাবে সমীরে নিক্কন তাহার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৭

আবার জ্যোৎস্না জাহ্নবী পুলিনে,
হাসিয়া সাজাবে মোহন ভূষণে ;
চপলা তটিনী হাসিবে আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৮

নবীন নীরদে হেরিয়ে শিখিনী,—
নাচিয়া হাসিতে হাসাবে অবনী,
ভুলিবে, ভুলাবে মানবে আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

৯

শরতে চাঁদনী—ছাঁদনী হেরিয়া,
ধাইবে চকোর সুধার লাগিয়া,
হাসিতে মিটিবে পিয়াসা তাহার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

১০

উদিবে অম্বরে জলদ যখন,
আবার চপলা হাসিবে তেমন,
হাসিতে তাহার ঝরিবে আসার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

১১

হাসরে জগৎ চন্দ্রমা হাসরে,
হাসিতে তোদের ঝরুক সুধারে,
হাসলো যামিনী হাস গো আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

১২

হাস গো তটিনী, হাসরে পুলিন,
হাস হে সমীর, নীরদ নবীন,
হাসলো চপলা হাসলো আবার,
এ জীবনে বুঝি হায় হাসিব না আর।

শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমেশ।

(১)

বিজয়গড় একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ। এই দেশে মাধবিপুর নামে এক[illegible] আছে। তথায় রমেশ ও সুরমা নামে দুইটি ভাই ভগ্নী তাহাদের মাতা [illegible] পর্ব্বতের পাদদেশে এক ক্ষুদ্র কুটির মধ্যে বাস করিত। এই পাহাড়কে [illegible] মাধবি পাহাড় বলে। তথাকার গ্রামবাসিদের মধ্যে একটি পুরাতন [illegible] প্রচলিত ছিল যে ঐ পাহাড়ে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ও নিশাকালে পরী [illegible] অন্যান্য উপদেবতা সকল বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই কারণে তথায় [illegible]কালে বা দিবসের মধ্যভাগে কেহ যাইত না!

রমেশের মাতা অতি দরিদ্রা; ঐ পাহাড় হইতে ফলমূল আনয়নপূ[illegible] উহা বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য উপার্জ্জন করেন, তাহাতে কষ্টের সহিত কো[illegible]রে তাহাদের দিনযাপন হয়। রমেশ ও সুরমা পাহাড় হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া তাহাদের মাতাকে বিলক্ষণ সাহায্য করে। প্রতিদিন বৈকালে উহারা দুই ভাই ভগ্নীতে দুইটি ছোট পেতে লইয়া বনমধ্যে চেরিফল তুলিতে যায়। এই ফল দেখিতে কুলের অপেক্ষাও ছোট, খাইতে অম্লটক ও মিষ্ট, মিষ্ট একপ্রকার লাগে। সে দেশের লোকেরা এই ফলের আচার করিয়া খাইতে বড় ভালবাসে।

প্রতিদিনের ন্যায় এক দিবস বৈকালে উক্ত বালক বালিকা পাহাড়ে গিয়া চেরি কুড়াইতেছে, অন্য দিন অপেক্ষা অদ্য অনেক ফল পড়িয়াছে। সুরমার পেতেটি শীঘ্রই পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আজ তাহাদের বড়ই আনন্দ হইয়াছে, একদিনও এত চেরি পায় না। আজ মাতা কতই না আহ্লাদিত হইবেন, এই

ভাবিয়া তাহারা অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিতেছে, সুরমার পেতেতে আর চেরি ধরিতেছে না দেখিয়া বালিকা তাহা একটী বৃক্ষমূলে রাখিয়া, আপনার কাপড়ে জড় করিতে লাগিল। এক্ষণে সূর্য্য অস্ত যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কাননে উচ্চ বিটপিকুলের নিম্নদেশ ক্রমে অন্ধকার হইতেছে। সুরমার আরও কিছু কুড়াইবার ইচ্ছা থাকিলেও রমেশের কথায় বাটি ফিরিবার মন করিল। তখন বালিকা বৃক্ষতল হইতে তাহার রক্ষিত চেরি-গুলি লইতে গিয়া দেখিল, তথায় একটিও চেরি নাই বা পেতেও নাই। উভয়ে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল, অনেকক্ষণ খুঁজিল, কিছু পাইল না। শেষে সুরমা কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া রমেশ সুরমাকে বলিল, "সুরো! অন্ধকার হচ্চে তুই বাড়ী যা, আমি পেতে খুঁজে নিয়ে যাচ্চি।"

রমা। "না দাদা, আমি একলা যেতে পার্ব না।"

মশ। "আচ্ছা, আমি তোকে পাহাড়ের নিচে পর্য্যন্ত রেখে আস্চি; মাবে বলিস্, আমি এখনি চেরি ও পেতে নিয়ে যাচ্চি।"

মশ সুরমাকে সঙ্গে করিয়া পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া উহা-টিরের গবাক্ষদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল, "ঐ আমাদের লো জল্চে, তুই দৌড়ে যা।"

ন বালিকা বারিপূর্ণ-লোচনে তাহাদের গৃহে যাইয়া পৌছিল।

(২)

তাহাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, জননী চিন্তাকুল হৃদয়ে কুটিরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৎপরে সুরমা আসিল, রমেশ আসিল না এবং সুরমার চক্ষে জল দেখিয়া, তাঁহার চিন্তা আরো বৃদ্ধি হইল। সুরমার নিকট সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। গ্রামের অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহারও উপদেবতাদির প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি বাটী হইতে কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া, অনেকবার উচ্চৈঃস্বরে রমেশকে ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতাদিগের নিকট কত মানত করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রিয়জনের অমঙ্গল চিন্তাই অগ্রে হয়। রমেশের মাতা নিঃসন্দেহ মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহার পুত্রকে কোন উপদেবতা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে অবসন্ন হৃদয়ে মাতা ও কন্যা কুটিরের বাহিরের অপরিষ্কার দাওয়ায় মৃত্তিকোপরি নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন।

(৩)

রমেশও পুনরায় বনমধ্যে অনেক অন্বেষণ করিয়া, অপহৃত পেতেটি পাইল না। কে চুরি করিল, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, উচ্চ বৃক্ষসকলের ভিতর দিয়া সেই চাঁদের আলোক স্থানে স্থানে পতিত হইয়াছে। রমেশ সেই আলোকে দূর হইতে পেতে ভ্রমে নিকটে যাইয়া কত দ্রব্য হাতে করিয়া দেখিল, সকলবারেই বিফল মনোরথ হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তবোধ হওয়াতে একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিল এবং শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তখন রমেশ দেখিতে লাগিল, কিছু দূরে পাহাড়ের [illegible]কটী গহ্বরের ভিতর যেন এক একবার কি জ্বলিতেছে। কৌতূহল বশতঃ [illegible] গমন করিয়া সতর্কের সহিত শ্রবণ করিল, যেন সেই গুহা হইতে অ[illegible] ক্ষীণ গ্লানি সূচক একটী শব্দ আসিতেছে। উহা শুনিলে বোধ হয়, যেন [illegible]কান প্রাণী কঠিন পরিশ্রমে [illegible] হইয়া এরূপ করিতেছে। রমেশ এদিক [illegible] দেখিতে দেখিতে সেই দ্বারের নিকট মনুষ্যের আকৃতি বিশিষ্ট অথ[illegible] ক্ষুদ্র একটী [illegible] একটী তাহারই মত বৃহৎ দ্রব্য লইয়া টানাটানি [illegible]তেছে দেখিল। তাহার বোধ হইল, যেন সেইটিকে ভিতরে লইয়া [illegible]র চেষ্টা করিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যটির পোষাক অতি সুন্দর, গাত্রে রৌপ্যের ন্যায় [illegible]ল শ্বেতবর্ণের কোন মূল্যবান ধাতু নির্ম্মিত জামা, আর মস্তকে অতি [illegible]ল হীরকমণ্ডিত টুপি। রমেশ পূর্ব্বে যে আলোক দেখিতে পাইতেছিল, তাহ[illegible] ঐ সকল হীরকের আভা। সতর্কতার সহিত দেখিতে দেখিতে হীরকের আলোকে সে দেখিতে পাইল যে, যে দ্রব্যটি লইয়া টানাটানি করিতেছে, তাহা অপর কিছু নয়, সুরমার সেই পেতেটি, তাহাতে সামান্য চেরি পড়িয়া আছে মাত্র। তখন রমেশ কোন চিন্তা না করিয়াই নিকট হইতে একটী ছোট বৃক্ষ শাখা কুড়াইয়া লইয়া, অপর হস্তে তাহার জামা ধরিল। তখন সেই ক্ষুদ্র প্রাণী অতি সূক্ষ্মস্বরে ইন্দুরের ন্যায় একপ্রকার চিৎকার করিতে লাগিল; ভীত হইয়া পেতে ও চেরি ফিরাইয়া দিতে চাহিল এবং ছাড়িয়া দিবার জন্য কাতরকণ্ঠে অনেক মিনতি করিতে লাগিল। রমেশ, পেতেটি প্রায় খালি দেখিয়া, বাকি

চেরিগুলি চাহিল। ছোট মানুষটি সেগুলি আনিয়া দিবার জন্য স্বীকৃত হইল; কিন্তু রমেশ বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিল না। তখন অগত্যা সে তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিল।

রমেশ সেই অল্পপ্রশস্ত গহ্বরের ভিতর মস্তক নিচু করিয়া এবং একহস্তে জামা ধরিয়া সাথে সাথে চলিল। যতই নিকটে যাইতে লাগিল, ততই যেন অতি সূক্ষ্ম স্বরের গীত বাদ্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিয়দ্দুর গমন করিয়া সম্মুখে এক প্রস্তরের কবাট ভিতর হইতে রুদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাইল। সেই ক্ষুদ্র জীবটী এইবার একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ছোট হাতুড়ি দ্বারা দ্বারে তিনবার আঘাত করিল এবং উহা উন্মোচিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে এরূপ তেজোময় আলোক আসিয়া রমেশের চক্ষে লাগিল যে, [illegible] চাহিয়া থাকিতে পারিল না। চক্ষে হাত চাপা দিয়া, তাহার সহিত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন করিল। এইবার রমেশের কিছু ভয় হইল, পরি[illegible] জ্যর কথা, উপদেবতার কথা মনে পড়িল। ক্রমে তাহাকে এমন এ[illegible] প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল, যেখানকার আলোক সবুজ বর্ণের, উজ্জল হইলেও [illegible] দেওয়ালে সবুজবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর সকল লতাপাতার আকারে [illegible] আছে এবং তাহার জ্যোতিতেই ঘর আলোকিত হইয়াছে। ঘরের ম[illegible]একখানি স্বচ্ছ সবুজ প্রস্তর নির্ম্মিত অতি মনোরম সিংহাসন রহিয়াছে, [illegible], রৌপ্য, হীরকময় পরিচ্ছদ পরিহিত সেইরূপ একটী ক্ষুদ্র প্রা[illegible] রাজদণ্ড লইয়া বসিয়া আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষু[illegible] জীব, মাথায় হীরার টুপি ও গাত্রে রূপার জামা পরিয়া সকলেই নিজ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। রমেশকে দেখিবামাত্র সকলে বিস্ময় নেত্রে চাহিয়া [illegible]হিল। রমেশ যাহা ভাবিতেছিল, তাহা ঠিক, ইহা বাস্তবিকই পরি-রাজ্য।

রমেশকে রাজার নিকট দণ্ডায়মান হইতে কহিল। তখন সেই পরি আদ্যোপান্ত সকল কথা রাজাকে নিবেদন করিল। রমেশ তাহাদের কথোপ-কথনের কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "বৎস, দেখিতেছি তুমি মনুষ্যশিশু। তুমি এ সময়ে এই গভীর অরণ্য মধ্যে কি কারণে আসিয়াছ?"

রমেশ তাহাদের চেরি কুড়ান, সুরমার পেতে শুদ্ধ চেরি চুরি, এবং সেই চেরির অন্বেষণের জন্য এখন বনে আসিয়াছে, তৎপরে পরির সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি সকল কথা রাজাকে বলিল।

রাজা *। "তোমার সে চেরি তুমি আর পাইবে না। অদ্য আমাদের একটী উৎসবের দিন; সেই চেরি এই উৎসবে ব্যবহার হইবে। উহার যত মূল্য লাগে, আমি তোমায় দিব। আর তুমিও অদ্য বাটী যাইতে পাইবে না, কল্য আমার ভৃত্য তোমাকে তোমার মাতার নিকট রাখিয়া আসিবে।

রমেশ।—"আপনার এই চেরি কিনিবার উপযুক্ত অর্থ আছে কি ?"

রাজা। "নির্ব্বোধ বালক, দেখিতেছ না কি, আমার এই প্রাসাদের সকল দ্রব্যই স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত। আমার সহিত আইস, তোমাকে আমার ধনাগার দেখাইয়া আনি।"

যখন রমেশ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনাগার দর্শন করিতে গমন করি[illegible] তথায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরক পর্ব্বতাকারে রহিয়াছে; দেখিলে বোধ হয় ই[illegible] কোন হিসাব নাই। তাহার মনে মনে বড় ইচ্ছা হইতেছিল যে, [illegible] বলিয়া সে ইহার অতি সামান্য গ্রহণ করে; কিন্তু বলিতে সাহস হই[illegible]ল। এইবার রাজার সহিত ভোজন গৃহে গমন করিল। অন্যান্য পরিগণের সহি[illegible] সেও সুবর্ণপাত্রে বহুপ্রকার উপাদেয় আহারীয় ভোজন করিল, কিন্তু উদর [illegible] না। অধিকাংশ খাদ্যই উদরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে জিহ্বাতেই মিশাইয়া গে[illegible]

ভোজন শেষ হইলে সকলেই নৃত্য গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে [illegible]। রমেশকেও তাহাতে যোগ দিবার জন্য সকলে অনুরোধ করিল। [illegible]শ তাহার হীন বেশের জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন প[illegible] উপযুক্ত অন্য কোন উপযুক্ত পরিচ্ছদ না পাইয়া, হীরক ও অন্যা[illegible] মূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত একটী গহনা দেখিতে ফুলের মালার ন্যায়, তাহার [illegible] দিয়া মস্তকে পরিতে বলিল। অনেকক্ষণ পরে নৃত্য গীত শেষ হইল, বাটি যাইবার জন্য এইবার রমেশের মন ব্যাকুল হইতেছিল। সে তখন রাজার নিক[illegible] চেরির মূল্য প্রার্থনা করিল। রাজা স্বয়ং মূল্য আনিতে আসন ত্যাগ করিয়[illegible] উঠিয়া গেল। কৌতূহল বশতঃ রমেশ সেই সবুজ রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিল। রাজা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই রমেশ পরিগণের উত্তম ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

* রাজা। "তুমি আমার এই গুপ্ত রাজ্যে প্রবেশ করিলে কেন ?"

রমেশ। "এই ক্ষুদ্র পরি আমার চেরি চুরি করিয়াছে। আপনি উহাকে আমার চেরি ফিরাইয়া দিতে অনুমতি করুন।"

(৪)

যখন দরিদ্র রমেশের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রকৃতি আবার হাস্যময়ী হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বগগনে ঈষৎ আলোক দেখা দিয়াছে। দু একটী নক্ষত্র এখনও যাহা আকাশের গায় ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা প্রভাহীন প্রায়, পার্ব্বতীয় পক্ষীগণ প্রভাতি গাহিতেছে; আর মৃদু সমীরণ পুষ্পসৌরভ সহ সেই গীত কাননের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত করিতেছে।

রমেশ চক্ষু রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে বলিয়া উঠিল, 'আমি কোথায়'। তৎপরে বৃক্ষতলে উঠিয়া বসিল, তাহার গত রাত্রের সকল কথা মনে হইতে লাগিল। পরি-রাজা চেরির মূল্য আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে মূল্য দি　　ক না, মনে আসিল না। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, কিছুই নাই। াহার মূল্য কিছুই পায় নাই দেখিয়া, তাহার বড় দুঃখ হইতে 　অবশেষে মনে ঠিক করিল, পরিগণ তাহাকে ঠকাইয়াছে, সে ইলে সকলে মিলিয়া তাহাকে এই গাছতলায় রাখিয়া গিয়াছে। য়া রমেশ সেই গহ্বরের অন্বেষণে পুনরায় পর্ব্বতের এদিক ওদিক কিন্তু তাহা আর পাইল না। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া লোচনে নিজ কুটিরে ফিরিয়া আসিল।

শ তাহাদের গৃহে যাইয়া প্রথমে মাতাকে উঠাইল। তিনি তাহাকে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, দেবতাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতে ন এবং তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কতবার মুখে চুম্বন করিলেন। তৎপরে নীর স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। সুরমাও দাদাকে দেখিয়া, বড়ই আনন্দিত হইল। গৃহের মধ্যে তখনও বেশ আলোক আসে নাই, সেই কারণে মাতা প্রদীপ জ্বালিলেন। সুরমা এইবার দাদার মস্তকে কি একটী উজ্জ্বল সামগ্রী দেখিতে পাইল। সেটি আর কিছুই নয়, সেই পরিপ্রদত্ত হীরার মালা। সুরমা দাদার মস্তক হইতে উহা খুলিয়া লইয়া, মাতাকে দেখাইল, রমেশের তখন উহার কথা মনে হইল। তাহার জননীর মনে এইবার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, তাহার পুত্র বাস্তবিক সমস্ত রাত্র পরি-রাজ্যে অতিবাহিত করিয়াছে; সত্যই পরিগণ মালাটি তাহাকে দিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

গোলাপ ফুল।

বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন, গোলাপফুলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ অতুল-
নীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্ট যত প্রকার সুন্দর বস্তু আছে, বোধ হয়, তন্মধ্যে
গোলাপ ফুলই সকলের শ্রেষ্ঠ। আরও অনেক প্রকার ফুল দেখা যায়, যাহা
সৌন্দর্য্যে গোলাপ ফুলের মত, কিন্তু একাধারে সৌন্দর্য্য ও মন-মাতান সদগন্ধ
বুঝি আর কোন ফুলের নাই। কি দেব পূজায়, কি প্রেমিক প্রেমিকার
উপহারে, কি বি াহে, কি উৎসবে প্রধান অঙ্গ গোলাপ ফুল। ব্যথিতের
ব্যথা, শোকাতুরের শোক, বিরহির বিরহ, যে একটী সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ
ফুল ক্ষণেকের জন্যও ভুলাইয়া দেয়, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।
গাজিপুর ইস্তাম্বুল, কনষ্টাণ্টিনোপল একমাত্র গোলাপের জন্যই জগৎ ... ।
একমাত্র গোলাপ ফুলের নিমিত্তই বৈদ্যনাথে মেল্ থামে। গো...
ঔষধার্থেও ব্যবহার্য্য। গোলাপফুলের পাপ্ড়িগুলি জলে সিদ্ধ করি...
ইলে ধারক এবং শর্করা সহ মিশাইয়া "গুলকন্দ" হয়, ইহা "মৃদু ...
স্নানের পর প্রতিদিন নিয়মিত গোলাপজল ব্যবহার করিলে যাবতীয় ...
আরোগ্য হয়। এমন যে প্রিয়বস্তু চক্ষু, তাহার যাবতীয় পীড়ায় গো...
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের বাগানে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল ...
উৎকৃষ্ট গোলাপ জল প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। ব্য...
নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। শুনা গিয়াছে যে, আমেরিকার ...
প্রদেশের পাগলা গারদের পাগলদিগকে গোলাপ ক্ষেতে কাজ করিতে ...
হইত। গোলাপের সদগন্ধে তাহাদের মন প্রফুল্লিত ও মস্তিষ্ক শীতল ...
অল্প দিনের ভিতরেই তাহাদের মধ্যে অনেক লোক অনেকাংশে আরোগ্য
লাভ করিয়াছিল। অতএব দেখুন, গোলাপফুল আমাদের কিরূপ প্রয়োজনীয়
বস্তু। উদ্যান সাজাইবার উপযুক্ত প্রায় ৩৫০ প্রকারের গোলাপের কলম
"পারিজাত-নার্শারিতে" পাওয়া যায়। তাহাদের বিবরণ মূল্য তালিকায়
দেখুন।

হেড আফিস—হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পারিজাত নার্শরির

"বাগান" মাণিকতলা, কলিকাতা। একমাত্র স্বত্বাধিকারি

শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ, আর, এইচ, এস।

REGISTERED No. C 116,

আলোচনা

সিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

} মাঘ, ১৩০৭ সাল। { দশম সংখ্যা।

ণের নাম—শ্রী শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর শেঠ, সম্পাদক।

সূচী।

ম্যানেজার—শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়—৮৩ নং পঞ্চাননতলা রোড.—হাওড়া।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র] [প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ আনা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের আলোচনা একত্রে ১২ খানা মূল্য ১৲, দুইবর্ষের একত্রে ১।০ টাকায় পাইবেন। মাশুল স্বতন্ত্র।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ। } মাঘ, ১৩০৭ সাল। { দশম সংখ্যা।

আশা কানন।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

...নীর অলৌকিক রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া যুবক অতীব বিস্ময় ...র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি কোমলাঙ্গী বালিকা এই নির্জ্জন ...শ একাকিনী অবস্থান করিতেছ। সরলে! তোমার কি কেহই নাই।"

...াছে।"

...থাছে।"

...াতা প্রভৃতি সকলই আছেন। কিন্তু আমি লোকালয় পরিত্যাগ ক...রিয়া একাকিনী নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিয়া থাকি। পথশ্রান্ত ক্লান্ত পথি-...র ক্লান্তি নিবারণ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

যুবক বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে বালিকার উজ্জল বদনমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া আবার বলিলেন, "বরাননে? তুমি এরূপ ভয়াকুল স্থানে একা-কিনী বাস কর, তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?"

বালিকা হাসিয়া বলিল, "আমি বালিকা কখনও কাহারও কোনও অনিষ্ট করি নাই,—তবে কে আমার অনিষ্ট সাধন করিবে।"

যুবক ঈষৎহাস্ত করিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও আপনাকে বালিকা বলিয়া পরিচয় দিতেছ, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি এক্ষণে বাল্যের সীমা অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছ; সরলে! তোমার অতুল রূপরাশি, উন্নত যৌবন, ইহারা কি তোমার শত্রু নহে?"

বালিকা সদম্ভে উত্তর করিল, "এই নির্জ্জন প্রদেশে কাহার সাধ্য আমার কৌমার্য্য নষ্ট করে ; কে সতীর সতীত্ব নষ্ট করিবে ?"

যুবক বালিকার এতাদৃশ গর্ব্বিত বচনে অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরাননে ! তোমার নাম কি ?"

কামিনীর অধর প্রান্তে অস্ফুট হাস্যালোক দেখা দিল। কিন্তু যুবক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। নবীনা কামিনী তাঁহার দিকে কুটীল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। যুবক আত্মবিস্মৃত হইয়া আবার বলিলেন, "অয়ি প্রিয়ম্বদে ! তোমার পিতা মাতা কোথায় ?"

কামিনী কহিল, "তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত রহিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি তাঁহাদের নিকট থাকি না।"

যুবক ঈষৎ বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রা[illegible] কঠিন, যে তুমি অনায়াসে তাঁহাদের সহবাস ত্যাগ করিয়াছ।"

কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "প্রত্যহই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই।"

"তাঁহারা কোথায় ?"

"তাঁহারা এখান হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন। আমি [illegible] করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদের নিকট যাইতে পারি।"

যুবক অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন "তবে কি তুমি কুহকিনী[illegible]

"না।"

"কে তুমি ?"

কামিনী কহিল, "আমি অনূঢ়া বালিকা, কুহকিনী নহি।" যুবক চমৎ[illegible] হইলেন। কহিলেন "কুহকিনী নহ ?—তবে তোমার বহুদূরস্থিত পিতামাতা[র] সহিত এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে সাক্ষাৎ কর ? এই সুবিস্তৃত অট্টালিক[া] কাহার ?" "আমিই ইহাতে বাস করি—ইহা আমারই।"

যুবক আবার বলিলেন, "যখন আমি এখানে আসিলাম, তখন তো ইহ[া] আমার নয়নগোচর হয় নাই।"

কুমারী কামিনী আর একবার তাঁহার প্রতি কুটীল কটাক্ষপাত করিল।

যুবক কহিলেন, "আমি এখানে কিরূপে আসিলাম ?"

"আমিই আপনাকে এখানে আনিয়াছি, আমারই জন্য আপনি স্বরাজ্য, গৃহত্যাগ করিয়া এতদূরে আগমন করিয়াছেন।

হে রাজকুমার! আপনি আমার এবম্প্রকার অদ্ভুত বচনাবলি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন না। আমি আপনাকে উত্তম চিনিয়াছি। আপনি কাশ্মীরের রাজপুত্র, আপনার নাম অমরেন্দ্র সিংহ।

যুবক স্তম্ভিত হইলেন, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত কামিনীর মুখে আপনার পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার স্মৃতি-পথে কি এক অলৌকিক ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার স্মরণ হইতেছে, একদা রজনী যোগে প্রাসাদশিখরে তোমারই ন্যায় সুন্দরী সরলার অস্ফুট ছবি অবলোকন করিয়া অতীব আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়াছিলাম। সরলে!—সে কি তুমিই?—আমি সেই অবধি সর্ব্বক্ষণ তোমার এই অপরূপ রূপরাশি চিন্তা করিয়া কালযাপন করিতেছি। স্বপ্নে তো[illegible] রূপরাশি অবলোকন করিয়া আত্মার চরিতার্থতা সম্পাদন করি। [illegible] কি আমার সহিত ছলনা করিতেছ?"

[illegible]কা আবার হাসিল, সে বিমলাস্যে অস্ফুট হাসি অবলোকন করিয়া, [illegible]র ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে আবার বলিলেন, "কে [illegible] হতভাগ্য সন্তপ্ত যুবকের হৃদয়পটে অস্ফুট আশার ছবি অঙ্কিত ক[illegible]-সুন্দরী! তোমার নাম কি?"

[illegible]খনি আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া কামিনী গৃহান্তরে গমন করিল, [illegible] ভাবিলেন, এ কামিনী কি কুহকিনী?—আমি এখানে কিরূপে [illegible]? কুমারী কি আমার সহিত ছলনা করিতেছে?"

ইত্যবসরে কামিনী ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজকুমার ব্যস্ত-[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি! চারুশীলে! বল তোমার নাম কি?"

কামিনী কহিল—

"ব্যস্ত হইবেন না। হে রাজনন্দন! অদ্য আপনি আমার আলয়ে অতিথি হইয়াছেন। অতএব মদত্ত এই অঙ্গুরীয়কটী গ্রহণ করিয়া আমার আশা পূর্ণ করুন। ইহা হইতেই আপনি আমার সমস্ত পরিচয় অবগত হইবেন। আপনি আমাকে কুহকিনী ভাবিয়া অবিশ্বাস করিবেন না।—আমার দ্বারা আপনার কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা করিবেন না। এক্ষণে আপনি স্বরাজ্যে গমন করুন, আবশ্যক হইলে আবার আমার দেখা পাইবেন।"

রাজপুত্র কুমারীদত্ত অঙ্গুরীয়কটী গ্রহণ করিলেন। অজ্ঞাত কুলশীলা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুমারীরত্ন অমরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে বলিল।

"দেখা হলো ভাল হলো সুধাইও তায়।
বোলেছে যে তার তরে করি কি উপায়।"

অমরেন্দ্র ভাবিলেন, এ কামিনী কে? কুমারীও এই অবসরে গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইল। অমনি অমরেন্দ্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হায়! কে জানে এরূপ সরলতায় অকস্মাৎ গরল উৎপন্ন হইল কেন?"

এদিকে দেব দিবাকর পূর্ব্ব গগনে আবার হাসিতে হাসিতে দেখা দিলেন। প্রকৃতির ক্রোড়ে জীবকুল আবার জাগিয়া উঠিল। উলারের তরঙ্গাবলী বাল-সূর্য্য কিরণে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে করিতে কল কল স্বরে প্রকৃতির স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। প্রাতঃসমীরণ ধীরে বহিয়া জগৎ মাতাইল; কুসুম ফুটিল, সৌরভ ছুটিল; যুবরাজ অমরেন্দ্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি উলারের উপকূলে বৃক্ষমূলে শায়িত রহিয়াছেন। তঁ... ...জভর তেজস্বী অশ্ব তাঁহার চরণতলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান।

এ কি?—কোথায় অনন্ত শান্তিপূর্ণ অপার সুখ সাগরের অন... মালায় তৃষিত চিত্তের আনন্দবর্দ্ধন, আর কোথায় কঠোর মরুভূমি... ...লুকারাশির স্ফুলিঙ্গাঘাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কোথায় সুচারু সুসজ্জিত হর্ম্যকক্ষে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় সহচরীর সহিত সুমধুর প্রেম সম্ভাষণ—আর কোথায় বিপদ সঙ্কুল বি... ণ্যের প্রান্তভাগে উত্তাল তরঙ্গবাহি মহাহ্রদ উলারের সুবিস্তৃত তীরে ভূতলে শয়ন!! নিদ্রার কি মোহিনী শক্তি! স্বপনের কি অলৌকিক...

নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর রাজকুমার ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। স্ব... স্বপন বৃত্তান্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন কি দেখিলাম? কোথায় ছিলাম কোথায় আসিলাম? এ নির্জ্জন প্রদেশে... আমাকে মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ করিল? ফলতঃ—স্বপ্ন দৃষ্ট সুবৃহৎ অট্টালিক... কোনও চিহ্নই তাঁহার নয়নগোচর হইল না। তিনি সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন, কামিনীর পরিচয় স্বরূপ তাহারই প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরী তাঁহার অঙ্গুলীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে "বিজলা।"

রাজকুমার ভাবিলেন, কুমারীর নাম 'বিজলা;' কিন্তু বিজলা কে? তাহার কমনীয় কান্তি এখনও তাঁহার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার বীণা বিনিন্দিত সুমধুর বচনাবলি এখনও যেন তাঁহার শ্রবণ বিবরে মধুরস্বরে প্রতি-ঘাত করিতেছে

অমরেন্দ্র ভাবিলেন,— স্বপ্ন কি সত্য হইতে পারে ? উহাতো অমূলক চিন্তা মাত্র। তবে আমার মন সেই অনূঢ়া কামিনীকে দেখিবার জন্য এত আকুল হইতেছে কেন ?—যেন মনে হইতেছে, আর একবার তাহার সেই সরলতা মাখা সুন্দর মুখে মধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া প্রাণ শীতল করি—মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। বিজলা আমাকে যে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছে, তাহাতো এখন আমার হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে যে এ স্বপ্ন সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব। নিশ্চয়ই কেহ আমার সহিত ছলনা করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রত্ন লাভের আশা কল্পনায় আনা যায় না, যাহা একান্ত দুর্লভ, যাহার স্থিতির স্থিরতা নাই, তাহার জন্য প্রাণ এত আকুল হইল কেন ? বিজলা নিশ্চয়ই দেবী কি দানবী, যক্ষী কি রাক্ষসী, অপ্সরী কি কিন্নরী, নতুবা [illegible]র কার্য্যপ্রণালী মনুষ্যের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য [illegible] এ অঙ্গুরীয়ক হইতে কিরূপে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইব ; তাহার তাবৎ [illegible]ন্ত কিরূপে অবগত হইব ? বিজলা আমাকে আশ্বাস বচনে তুষ্ট করিয়া [illegible] প্রতিগমন করিতে কহিল, তাহার কারণ কি ? সে বলিল 'আবশ্যক হইলে [illegible]ার আমার দেখা পাইবে ;'—কিন্তু কিরূপে সেই সর্ব্বসুলক্ষণা নবযৌবন[illegible]নোন্মুখী ললনার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইব ?—তবে কি এ কামিনী কুহ[illegible]নী ! বিজলার কথিত অভিনব কবিতাটীর তাৎপর্য্য কি ? অমরেন্দ্র আর [illegible]কবার সেই কবিতাটী পাঠ করিলেন। কিন্তু তাহাতে চিন্তার হ্রাস হইল না। [illegible]য়ের অশান্তি দূর হইল না। তাঁহার বীর হৃদয় চিন্তার প্রবল তুফানে [illegible] হইয়া উঠিল। [ক্রমশঃ।

একটি তরঙ্গ।

(১)

সংসার নদীতে কত কি যে ভেসে যায়,
শত লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ আঘাত খায়,
তবুও অক্লান্ত ভাবে,
তরঙ্গ ভ্রূকুটী স'বে,
নাহি খেদ নাহি দুখ গতি অবিরাম,
জানেনা তটিনী কোথা দিবেক বিরাম।

(২)

আমিও ওরূপ ভাবে যেতেছি যখন,
তরঙ্গের অনুকূলে প্রফুল্ল মনন,
মিলিল দু'জন আসি,
তিনে হল মেশামিশি,
অচেনা অজানা তবু পলকে মিলন,
জানিনা কাহার গুণে ওরূপ ঘটন।

(৩)

কি যে মধুময় কথা শুনিল শ্রবণ,
কি যে মধুময় রূপ হেরিল নয়ন,
ভুলা'ল স্বজন দেশ,
ভুলা'ল প্রবাস ক্লেশ,
ভুলাল সকল কথা মরম বেদন,
এত কি ভুলান ভাব সুহৃৎ আনন।

(৪)

স্বরগের সুখরাজ্য হেরিনি কখন,
নন্দন কানন শোভা জানি না কেমন,
সব সুখ সব শোভা,
মনোলোভা সব বিভা,
সুখহীন মরতেতে, অপূর্ব্ব মিলন,
লভেছিনু যেই দিন বন্ধু সম্মিলন।

(৫)

উল্লাসে তোদের সনে ভ্রমিয়া উদ্যানে,
শ্রান্ত হয়ে শুইতাম জানু উপাধানে,
চাব কি আকাশ পানে,
তোর মুখ ব্যবধানে,
নীলিমার শোভা ভেবে হেরিয়াছি তোরে
তুইও (ত) বিভল হ'য়ে দেখিতিস্ মোরে।

(৬)

বটবৃক্ষ মূলে বসি' কত কথা হ'ত,
বলিতাম শুনিতাম পাগলের মত,
সংসারের কোন কথা,
দিত না হৃদয়ে ব্যথা,
কি জানি কত কি করে কাটিত সময়,
আনন্দ অমৃত রসে পূরিত হৃদয়।

(৭)

অভিমানে একদিন কাঁদিল পরাণ,
তখনই ধরিলাম তোমার চরণ,
চেয়েছিনু কত ক্ষমা,
চেয়েছিলে কত ক্ষমা,
হৃদিপটে সেই কথা রয়েছে অঙ্কিত;
সেদিন এখন হায়, কালকবলিত।

(৮)

বিপদ সাগর স্রোত ভাসাইতে তোরে,
বহিল প্রবলবেগে গভীর হুঙ্কারে,
প্রাণের আদেশ শুনি',
নিজ হিত তুচ্ছ গণি',
ঝাঁপ দিল সে সলিলে ভায়ের মতন,
আমাদের রাখিলেন পতিত পাব[illegible]

(৯)

আনন্দ অম্বরে যবে শান্তি-সমীরণ,
প্রবাহিত হ'তেছিল, মোহি অন্তক[illegible]
কাল মেঘ দেখা দিল,
ঝড়ে হৃদি ভেঙ্গে নিল,
দয়াময়ে ডাকি কত করিনু ক্রন্দন,
গেল না তাঁহার কাণে অভাগা বচন

(১০)

অখণ্ড শান্তির মাঝে অশান্তি প[illegible]
ফুল্ল কমলের মুখ আঁধার ঢাকিল,
পরমেশে লক্ষ্য করি',
লইলাম শিরে ধরি',
তোমার স্মরণ হেতু ব্রতের পালন,
মিলন হইলে পুনঃ হ'ল উদ্যাপন।

(১১)

বিচ্ছেদ ঘটালে হায় সন্দিগ্ধ পামর,
রে মূর্খ, দূরত্ব নাশে বাঁধন প্রাণের!!
গগনের সাত তারা,
অতি দূরে দূরে তা'রা,

তবু প্রাণে প্রাণে বাঁধা মালা গাঁথা সম!
দিস্ নাই হৃদি কা'কে তাই এত ভ্রম!

(১২)

অনিমেষে হেরিতাম সুদূরে তোমায়,
সতৃষ্ণ শঙ্কিত ভাবে হেরিতে আমায়,
শুধু তব হিত বোধে,
রেখেছিনু অবরোধে,
প্রতিশোধ হৃদি মাঝে করিয়া দমন,
হ'লে তৃণের সম ভাসা'ত উজান।

(১৩)

রীচিকা মানবে ভুলায়,
দর দেখে তোমরা আমায়,
বান্ধিরূপে কাছে রব,
অকাতরে প্রাণ দিব,
দয়া করে দেখ ভাই মনের ভিতরে,
না হলে নিরাশ রবি উড়াবে অম্বরে।

(১৪)

সে সব সুখের স্মৃতি বিষাদের তান,
পাষাণের বল দর্প কপটতা ভাণ,
মিশুক অনন্তে তা'রা,
হ'ক মিশে দিশে হারা,
ভুলে যদি কাছে আসে সবে এস ভাই,
গোণা কটা দিন মোরা ভালবেসে যাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"নাস্তি মাতৃ সমোগুরুঃ"

(১)

যা পুত্রস্য বিরতমসুখে দুঃখিনী স্যাৎ জনিত্রী,
যা দৃষ্ট্বা পুত্রসুখমনিশং সৌখ্যিনী স্যাৎ, ক্ষুধায়াঃ
কালং জ্ঞাত্বা বিমলমধুরং ভোজনং কারয়েৎ যা
তস্যা মাতুশ্চরণকমলে নম্যতে সন্ততং মে॥

মে ময়া "ত্বয়া ময়া ইত্যর্থে নতমে অব্যয়ৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি পদ্মনাভঃ॥

পুত্রের দুঃখেতে দুঃখিত যে জন।
পুত্রের সুখেতে হরষিত মন॥
যিনি, ক্ষুধাকাল জানিয়া অমনি।
ভোজন করান পুত্রেরে তখনি॥
ভোজনীয় দ্রব্য করি পরিষ্কার।
যিনি, পুত্রে ডাকি করান আহার॥
সেই মাতৃ পাদ-পদ্মে অনিবার।
হৃদি ভাবি পদ করি নমস্কার॥

(২)

আবাল্যান্মাতরশ্রান্তমতি গুরুতমং প্রোহ্য কার্য্যংহ্যবেক্ষ্যাং
কিন্ত্বানন্দং ভবত্যা নপত্তুপদনয়া বর্দ্ধয়েয়ং কদাপি।
হা মূঢ়োহহং সমাস্তে খলুসমভুবনে নাস্তিগুর্ব্বী দ্বিতীয়া
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ স্ব গুণ বিতরণে নম্যতে মেঽপি নিত্যং।

শৈশব হইতে হে মাতঃ সতত,
অতি গুরুতম কার্য্যেতে বিরত,
হইয়া আপনি অতি যত্ন করি,
পালিছেন মোরে কষ্ট সহ্য করি,
কিন্তু, মাতঃ এই অধম তনয়,
কভু তব যুগ্মপাদ কুশেশয়,
শুশ্রূষা করিয়া আপনার মন
করিতে নারিনু আনন্দ বর্দ্ধন।
হায়! মূঢ় আমি, নাই তব সম
ভুবনে দ্বিতীয় গুরুতম ক্ষম
মম দোষ, নিজ কৃপা বিতরণে
সদা শত শত প্রণতি চরণে।

(৩)

জগ্ধৌ মাত্রা বিনাকাপি মধুর বচনৈ স্তোষিতেঽস্থিতেন
স্থিত্বার্ভ্যর্ণং সুতস্যাপ্যবিরতমসুখং চেহতে বারনার্থং।
মাত্রাতুল্যোঽনূনং সুতগত মনসা নাস্তিগুর্ব্বী দ্বিতীয়া
তস্যৈ মাত্রে নমস্যা ম্যমল চরণয়োরেণবঃ পান্তু তস্মাৎ।

মিষ্টবাক্য দ্বারা সদা আহার প্রদানে
মাতা ভিন্ন তুষিতে না পারে কোন জনে
পীড়িত হইলে পুত্র থাকিয়া কাছেতে
করেন সতত চেষ্টা কষ্ট নিবারিতে
পৃথিবীতে গুরু নাই মাতার সমান
সর্ব্বদা শুভাকাঙ্ক্ষিণী সুতগত প্রাণ
করিতেছি শত শত নমস্কার তাঁরে
করুণ চরণ রেণুচয় রক্ষা মোরে।

(৪)

জাতে বনে তামরসে প্রসস্তৎ স্থিত্বা স একত্র যথা গুণং ন
জানাতি তদ্বৎ তনয়োঽস্মি মূঢ়ঃ স্থিতেঽপি তেঽন্তিকে গুণং ন জানে।

সারস কুসুম সরস সলিলে
জন্মিলে স্বথায়-দর্দ্দুর সে স্থলে
থাকিয়া একত্র যথা গুণাগুণ
জানিতে না পারে, তথা এ নির্গুণ
পুত্র আমি তব, নিকটে সতত
থাকি তব পরিচর্য্যাতে বিরত।
নাহি জানি তব শ্রীচরণ গুণ।
তবু মোরে হেরি হরষিত মন।

(৫)

দিনং গতং ব্যর্থ মনর্থ চিন্তয়া বিভাবরী সাচ গতাপি নিদ্রয়া
কদা জনন্যাশ্চরণারবিন্দং ময়াধমেনাপি বিচিন্তনীয়ং ॥

দিন গেল অনর্থক অনর্থ চিন্তায়
বিভাবরী সেও গত ক্রমেতে নিদ্রায়
জননীর পাদপদ্ম জন্মিয়া কখন
এ অধম হইতে না হইল স্মরণ।

(৬)

ত্রা সমা চেদপি বা প্রজাবতী পূজ্যা ভবেৎ কিন্তু সদাপি মানসং,
কোল-পেযূষ বচোভিরীষ্যতে মাত্রা সমানাস্তি গুরুর্দ্বিতীয় ঈ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ জায়া আদি করি মাননীয়া
মাতার সমান তাঁরা হন পূজনীয়া
তাঁহাদের বিষরূপ অমৃত বচন
দ্বারা, সদা তাহলেও দগ্ধ করে মন
সতত প্রণমি ভক্তি ভাবে শ্রীচরণে
মাতার সমান গুরু নাহি ত্রিভুবনে।

(৭)

বুভুক্ষাপি পুরঃ পুত্রং ভোজয়িত্বাঽস্তি যা প্রসূঃ
মাতরং তাং নমস্যামি নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ ॥

ক্ষুধান্বিত হইলেও হেরি পুত্রানন।
খাওয়াইয়া অগ্রে যিনি করেন ভোজন॥
নিরন্তর নমস্কার তাঁহার চরণে।
মাতার সমান গুরু নাহি ত্রিভুবনে॥

(৮)

নাস্তি বিষ্ণু সমোদেবো নাস্তি জ্ঞানাৎ পরং সুখং।
নাস্তি গঙ্গা সমং তীর্থং নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ॥
বিষ্ণু তুল্য দেব নাই জ্ঞান তুল্য ক্ষেম।
গঙ্গাসম তীর্থ নাই গুরু মাতৃসম॥

শ্রীগোপালদাস মুখোপাধ্যায়।

রমেশ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

মাতা উহা হস্তে লইয়াই বুঝিলেন, যে উহা দেখিতে পুষ্পগ্রথিতমাল মনে হইলেও তাহা নয়। আলোকের নিকট লইয়া গিয়া দেখিলেন, ইহা দ্রব্য নয়; নানা বর্ণের মূল্যবান প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া তাঁহার বোধ পরদিবস দুই চারিজন প্রতিবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া সেই মাল একটি অতি ক্ষুদ্র পাপ্‌ড়ি ভাঙ্গিয়া কোন মণি বিক্রেতার দোকানে গমন জানিলেন, উহা অতি মূল্যবান হীরক।

এইবার রমেশদের অভাব দূর হইল; প্রয়োজন হইলে সেই মা... অল্প অল্প বিক্রয় করিয়া তাহারা সুখে সংসার চালাইতে লাগিল। যতদিন জীবিত ছিল, তাহারা ঈশ্বর পদে মতি রাখিয়া ধনলাভ সত্ত্বেও অহঙ্কার শূন্য হইয়া, দীনজনে প্রতিপালন করিয়া কাটাইয়াছিল। ক্রমে গ্রামের সকলেই সেই বৃদ্ধা বিধবার সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিল। অনেকেই সেই আশ্চর্য্য রাজ্যের অন্বেষণার্থে পর্ব্বতে যাইতে লাগিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ সেই অদ্ভুত গহ্বরের কোন সন্ধান পায় নাই। *

শ্রীহরিহর শেঠ।

---

* কোন জার্ম্মাণ গল্পের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত। লেখক।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

মনে
দ্রব

পরা দিন রাজভক্ত। রাজা পিতার তুল্য, রাজ্ঞী মাতৃসমা, এই হিসাবেই মরা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জননী বলিয়া জানিতাম; মা বলিয়া ডাকিতাম, মায়ের ন্যায় ভক্তি করিতাম। মা অপেক্ষা মধুর, মিষ্ট ও হৃদয়ের সান্ত্বনায়ক শব্দ জগতে আর কিছুই নাই। হিন্দুর মন প্রাণ চিরকালই জননী চরণে বিক্রীত; মাতৃবৎসল হিন্দু তাই এতদিন রাজসিংহাসনে জননী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল, সকলেরই আশা ছিল, রাজরাজেশ্বরী মা আছেন—আর ভাবনা কি? আজ আমরা সেই বাৎসল্য প্রতিমা, স্নেহের পূর্ণমূর্ত্তি মাতৃহারা হইয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতেছি। যদবধি "মা বুলি" বলিতে শিখিয়াছি, যতদিন সুমধুর "মা" নাম রসনায় উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি; সেইদিন হইতে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে জননী জ্ঞানে পূজা করিতেছি! আমাদের পিতা পিতামহ যাঁহাকে বাৎসল্যের আধার বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আসিতেছেন। সেই পরম পূজনীয়া, প্রজাপুঞ্জের জননী

ণ্ডের রাজা প্রসিদ্ধ জনের প্রপৌত্রের পুত্র তৃতীয় এডওয়ার্ড। বিখ্যাত নর্ম্মান বিজেতা প্রথম উইলিয়মের প্রপৌত্র ছিলেন জন। ইংলণ্ডের এই প্রথম নর্ম্মাণ রাজা উইলিয়ম হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পঁচিশ বংশ পরে ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়াছিলেন। প্রথম উইলিয়ম ১০৬৬ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন; মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৯০১ সালে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মধ্যে নয়শত পঁত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লইয়া পাঁচজন নারী ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইয়াছেন। প্রথম মেরী ১৫৫৩ খ্রীঃ অঃ রাণী হন, পরে এলিজ্যাবেথ ১৫৫৮ সালে রাণী হইয়াছিলেন; তৎপরে তৃতীয় উইলিয়মের সহিত মেরী রাণী হইয়াছিলেন—স্বামী স্ত্রী উভয়ের নামে রাজকার্য্য পরিচালিত ..., ইঁহারা রাজা হন ১৬৮৯ খ্রীঃ অঃ; ইঁহাদের পরে য়্যান ইংলণ্ডেশ্বরী ...ছিলেন ১৭০২ খৃঃ অঃ; সর্ব্বশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ...রাজ্যেশ্বরী হইয়াছিলেন। এক রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডে ষষ্টিবৎসর ... করিয়াছিলেন, কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়া ত্রিষষ্টীবৎসর কাল ...করিয়াছেন। ফরাসীদেশের চতুর্দ্দশ লুই ব্যতীত, মহারাণী ভিক্টো-...র কেহ ইউরোপের কোন দেশে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে ...

...র ১০ই ফেব্রুয়ারি আমাদের মহারাণী প্রিন্স আলবার্টের সহিত ...

...র ২১শে নবেম্বর মহারাণীর প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়া এডিলেড ... হন। ইনি ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণসম্রাটের মহিষী ও বর্ত্তমান ...র মাতা।

(...) ১৮৪১ সালের ৮ই নবেম্বর আলবার্ট এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস ...ন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালের ১০ই মার্চ্চ ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেক-জান্ড্রার সঙ্গে প্রিন্স অব ওয়েলসের বিবাহ হয়। মহারাণীর স্বর্গারোহণে ইনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

(৩) ১৮৪৩ সালের ২৫ই এপ্রিল এলিস মডমেরী নামে এক কন্যা জন্মে। ১৮৬২ সালে ইহার বিবাহ হয়। ১৮৭৮ সালে মৃত্যু হইয়াছে।

(৪) প্রিন্স আলফ্রেড আরনেষ্ট আলবার্ট চতুর্থ পুত্র। ১৮৪৪ সালের ৬ই আগষ্ট ইহার জন্ম হয়। বর্ত্তমান রুষ সম্রাটের পিসি মেরী আলেকজান্ড্রোভনার সঙ্গে ১৮৬৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী ইহার বিবাহ হয়। ইনিই ডিউক অব

এডিনবরা। স্যাক্সকোবার্গের ডিউক আরনেষ্টের মৃত্যুর পর ইনি পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হন। ডিউক অফ এডিনবরার সেদিন মৃত্যু হইয়াছে।

(৫) পঞ্চম প্রিন্সেস হেলেনা অগষ্টা ভিক্টোরিয়া ১৮৪৬ সালের ২৬শে মে জন্মগ্রহণ করেন। জার্ম্মাণীর শেলসুইক হোলষ্টেনের প্রিন্স ক্রিশ্চিয়ানের সহিত ইনি পরিণীতা হন। ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৬) ষষ্ঠ কন্যা লুইসা কেরোলিনা আলবার্ট ১৮৪৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ ভূমিষ্ঠ হন। মার্কুইস্ অব লোরণ এখন তাঁহার নাম ডিউক-অব-আর্গাইল ইহারই সঙ্গে কুমারী লুইসার বিবাহ হইয়াছিল।

(৭) সপ্তম পুত্র আর্থার উইলিয়ম প্যাট্রিক আলবার্ট ডিউক অব কনট ১৮৫০ সালের ১লা মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে প্রসিয়ার প্রে[illegible] চার্লসের তৃতীয় কন্যার সঙ্গে ইহার বিবাহ হইয়াছিল।

(৮) অষ্টম পুত্র লিওপোল্ড জর্জ ডন্‌কান্ আলবার্ট ডিউক অ[illegible] আ[illegible] ১৮৫৩ সালের ৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালে [illegible] হইয়াছে।

(৯) নবম কন্যা বিয়াট্রিস মেরী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৭ সালে[illegible] ভূমিষ্ঠা হন। ব্যাটেন বার্গের প্রিন্স হেনরী মরিসের স[illegible] ২৩শে জুলাই ইহার বিবাহ হইয়াছিল। জামাতার মৃত্যু হ[illegible] সালে ডিসেম্বরে প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যু হয়।

যাও মা, ভাগ্যবতী, ঐশ্বর্য্যশালিনী মহারাণী, তোম[illegible] দেশে চলিয়া যাও। যে দেশের সামান্য একটু মহিমার কণা [illegible] তু[illegible] বিদিতা মহীয়সী মহেশ্বরী হইয়াছিলে, সেই প্রভাময় দেশে আবার চলি[illegible] ঐ দেখ মা, তোমার জন্য স্বর্গের হৈমকপাট উন্মুক্ত হইতেছে! ঐ[illegible] তোমার প্রত্যুদ্গমন মানসে স্বর্গের গন্ধর্ব্বকিন্নরগণ ভগবানের স্তুতিগীত করিতেছে! ঐ দেখ মা, তোমার বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া আদিকালের কত নরপতি, কত নারীরত্ন, কত জ্ঞানশ্রেষ্ঠ বুধ তোমাকে অভিবাদন করিতেছেন! আর যে সংসার তুমি এতদিন পুণ্যসৌরভ বিকীরণ করিয়া মনুষ্য সমাজকে ধন্য করিয়াছে,—সেই সংসারের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ। তোমার শবদেহ বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান জগতের নরশ্রেষ্ঠগণ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, তোমার ভারতের চিরদুঃখী প্রজাগণ দূর হইতে খেদের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, আর অন্তরীক্ষে থাকিয়া তোমার পিতৃপুরুষগণ দিব্য হস্তে

অদিব-কুসুম বর্ষণ করিতেছেন। ভুবনেশ্বরীর সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ লক্ষ্মীর নানাবিলাসে সুখী হইয়া, নিয়তির নিষ্ঠুর নিগ্রহ ধরিত্রীর করিয়া, সুর সুন্দরী তুমি, হাসিতে হাসিতে সুরলোকে চলিয়া গেলে; মরা তোমার চিরদুঃখী প্রজা তোমার মহা প্রস্থানের সমাচার পাইয়া হৃদয় গলাইয়া, ধারা বহাইয়া, শোকোষ্ণ দেহকে কথঞ্চিৎ শীতল।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

বাসী (২) হিতবাদী (৩) বঙ্গভূমি (৪) বিকাশ (৫) এডুকেশন গেজেট কা (৭) সারস্বত পত্র (৮) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী (৯) প্রতিবাসী (১০) ছায়া (১২) প্রয়াস (১৩) দারগার দপ্তর।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, আমরা এই পুস্তকের এক পাইয়াছি। পুস্তকখানিতে দেহতত্ত্বের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর য়াছে; সরল পদ্যে দেহস্থিত ষট্‌পদ্মের বর্ণনা অতি সুন্দর হই- ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য দুইআনা মাত্র, কলিকাতা বঙ্গভূমি ায়।

যুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা মহাশয়ের ৮তারকনাথ দেব প্রদত্ত াইয়া আমাদের একটী আত্মীয়কে ব্যবহার করিতে দিই, তিনি অম্ন রোগে ভুগিতেছিলেন অনেক চিকিৎসা করিয়াও রোগের কোন প্রতিকার হয় নাই, অশ্বিনীবাবুর প্রচারিত দৈব মাদুলী ধারণে আত্মীয়টীর রোগের অনেক উপশম হইয়াছে।

আজকাল বাজারে সুগন্ধি তৈলের ছড়াছড়ি—কিন্তু উপকারী তৈল কয়টা পাওয়া যায়? আমরা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের এক শিশি "কেশ-রঞ্জন" পাইয়া ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি—ইহা অন্যান্য তৈলের ন্যায় কেবল সুগন্ধযুক্ত নহে, ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল হয়, মনে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায় আর সৌগন্ধেরত কথাই নাই—এইরূপ তৈলের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আমরা কে, কে, দত্তের একশিশি বাতনাশক তৈল ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, তৈল বাতব্যাধির পক্ষে বিশেষ উপকারী, অল্পদিন ব্যবহারে ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, যাহারা বাতবেদনায় কষ্ট পাইতেছেন, আমরা তাহাদিগকে একবার এই তৈল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

গোলাপ ফুল।

বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন, গোলাপফুলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ
নীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্ট যতপ্রকার সুন্দর বস্তু আছে বোধ হয়, তন্মধ্যে
ফুলই সকলের শ্রেষ্ঠ। আরও অনেক প্রকার ফুল দেখা যায়, যাহা
গোলাপ ফুলের মত, কিন্তু একাধারে সৌন্দর্য্য ও মন-মাতান সদা
কোন ফুলের নাই। কি দেব পূজায়, কি প্রেমিক প্রেমিকার উপ
বিবাহে, কি উৎসবে প্রধান অঙ্গ গোলাপ ফুল। ব্যথিতের ব্যথা,
শোক, বিরহির বিরহ, যে একটী সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল ক্ষণে
ভুলাইয়া দেয়, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। গাজিপু
কনষ্টান্টিনোপল একমাত্র গোলাপের জন্যই জগৎ-বিখ্যাত। একম
ফুলের নিমিত্তই বৈদ্যনাথে মেল্ থামে। গোলাপ ফুল ঔষধার্থেও
গোলাপফুলের পাপ্‌ড়িগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে ধারক
সহ মিশাইয়া "গুলকন্দ" হয়, ইহা "মৃদু বিরেচক" স্নানের পর
মিত গোলাপ জল ব্যবহার করিলে যাবতীয় শিরঃপীড়া আর
যে প্রিয়বস্তু চক্ষু, তাহার যাবতীয় পীড়ায় গোলাপ জল ব্যবহৃ
আমাদের বাগানে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হইতে উৎকৃষ্ট গোল
করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। ব্যবসায়ীদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব
শুনা গিয়াছে যে, আমেরিকার কোন এক প্রদেশের পাগ্‌লা গারদের পাগল-
দিগকে গোলাপ ক্ষেতে কাজ করিতে দেওয়া হইত। গোলাপের সুগন্ধে
তাহাদের মন প্রফুল্লিত ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, অল্পদিনের ভিতরেই তাহাদের
মধ্যে অনেক লোক অনেকাংশে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। অতএব দেখুন,
গোলাপফুল আমাদের কিরূপ প্রয়োজনীয় বস্তু। উদ্যান সাজাইবার উপযুক্ত
প্রায় ৩৫০ প্রকারের গোলাপের কলম "পারিজাত-নার্শারিতে" পাওয়া
যায়। তাহাদের বিবরণ মূল্য তালিকায় দেখুন।

হেড আফিস—হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পারিজাত নার্শারি
"বাগান" মাণিকতলা, কলিকাতা। একমাত্র স্বত্বাধিকারী

শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ, আর, এইচ, এস।

REGISTERD No. C. 116.

আলোচনা

…সিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

… } ফাল্গুন, ১৩০৭ সাল। { একাদশ সংখ্যা।

…কগণের নাম—শ্রীম—বি-এ, শ্রীমহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার, শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী ও সম্পাদক।

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়—৮৩ নং পঞ্চাননতলা রোড,—হাওড়া।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র] [প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ আনা।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩০৭ সাল। | একাদশ সংখ্যা।

নূতন সম্রাট। আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিতা, মহামহিমাময়ী সাম্রাজ্ঞী রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ইংরাজের শাসন প্রণালীর চির প্রচলিত প্রথানুসারে মহারাণীর প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অবওয়েল্‌স সপ্তম এডোওয়ার্ড নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মাতার প্রিয় মাতৃগণে সমলঙ্কৃত হইয়া তাঁহার ন্যায় অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা; আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

রাজ পরিবারে উদ্বেগ। গত মাঘমাসে, মহারাণী ভারতেশ্বরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বিলাতে রাজ পরিবারের মধ্যে দৈব দুর্বিপাক বশতঃ নানা প্রকার উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমাদের নূতন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের পুত্র যুবরাজ ডিউক অব ইয়র্ক বিষম হামজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মৃতা মহারাণীর জ্যেষ্ঠাতনয়া জর্ম্মণ সম্রাটের জননী বহুদিন হইতে রোগ শয্যায় শায়িত তিনি এখন জর্ম্মন রাজ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান শোক বিদগ্ধ রাজ-পরিবারকে নিরাময় করুন তাঁহাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন, রাজ্যের মঙ্গল বিধান করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কাঙ্গালী ভোজন। মহারাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার চিরানুগত প্রজাগণ অনেকেই শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া শেষে ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মহারাণীর আত্মার সদ্গতির জন্য দলেং হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া কলিকাতার ময়দানে সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানে স্থানে অসংখ্য দীন দরিদ্র, অনাথ অনাথাকে অন্নদান করিয়া যথার্থ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করিয়া ছিলেন। কতকগুলি ধনী সন্তানের বিশেষ চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই কার্য্য হইয়াছিল, দরিদ্র প্রতি পালনে যাহাদের ইচ্ছাআছে তাঁহারা দীর্ঘ জীবী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করুন আমরা কায় মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

বড়লাটের উদারতা। হিন্দু পেটরিয়টের নাম যিনি শুনিয়াছেন তিনিই তাঁহার মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জানেন, অন্য কোন সম্প্রদায়ে মধ্যে সম্পাদক শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হরিশ বাবু যতদিন পেটরিয়টের সম্পাদক ছিলেন ততদিন উহা সংবাদ পত্রের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া ছিল। হরিশবাবু নির্ভীক হৃদয়ে দেশের যত উপকার করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধি কোন সম্পাদক সেরূপ ভাবে লেখনী চালনা করিতে পারেন নাই,পারিবেনও না। এমন স্বদেশহিতৈষী বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা কিছুই করি নাই; তাহাকে স্মরণ পথে রাখিবার জন্য কিছুই নাই, আছে কেবল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে একটী পুস্তকাগার আর ভবানীপুরে একটী রাজ পথ যাহা "হরিশ্চন্দ্র পথ" বলিয়া সাধারণের পরিচিত। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর কতিপয় সাহেব পুঙ্গবের জ্বালায় তাহা নাকি উঠিয়া যাইবার কল্পনা হইতেছে; মহাপুরুষেরা নাকি এই কার্য্যের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া ছিলেন। ইহার জন্য দেশীয় সংবাদ পত্র মহলে প্রতিবাদ হইয়া ছিল; আমাদের হৃদয়বান প্রতিনিধি নাকি এই কথা শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে কড়া করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়াছেন; মহামতি কর্জ্জনের অনুমতিতে রাস্তার উপর সাবেক নামই বহাল রহিল। প্রতিভাশালী মহাপুরুষের নিকট প্রতিভার আদর অক্ষুণ্ন রহিল; হিংসকারগণের মুখে চুণ কালী পড়িল। ধন্য বড়লাট! তোমার বিচক্ষণতার। তুমি যথার্থও গুণের আদর করিতে জান।

বিদ্যালয়ের কথা। শুনা যাইতেছে ডিরেকটর পেডলার সাহেবের পরামর্শে, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে সকল স্কুলে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সংস্রব নাই যাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনরূপ সাহায্য পান না, অথবা সেই বিদ্যালয় যদি সরকারী পরীক্ষায় ছাত্র পাঠান, বা সরকারী বৃত্তির দাবী দাওয়া করেন, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যালয়কে ও সরকারী কর্তৃত্বের অধীন হইতে হইবে এই আইন বাহাল হইলে সকল শ্রেণীর স্কুল সমূহকেই গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে স্বাধীন বিদ্যালয়ের সমূহের উপায় কি? তাঁহারা এখন শ্যাম রাখিবেন না, কি কুল রাখিবেন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(সচ্চিদানন্দ গুরু ও মুক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনুষ্যের কি সাধ্য যে অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। যাঁরা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে, জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

"আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, শুনে গেলুম যে একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো, সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম, কি হয়েছে। দেখি যে, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে ছাড়াতেও পারছে না, গিলিতেও পারছে না, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা ঘুচছেনা। তখন ভাবলাম, ওরে যদি জাতসাপে ধরতো, তাহ'লে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো; এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটার যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

"যদি সদ্গুরু হয় তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু

কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচেনা, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয়না।

বিজয়। মহাশয়? কেন আমরা এরূপ বদ্ধ আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না?

(অহঙ্কার বা মায়া।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় আমি অকর্ত্তা এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল! তার আর ভয় নাই।

এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"দেখ না, আড়াই হতে দূরে শ্রীরামচন্দ্র যিনি ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই।

এই দেখ এই গামছাখানা দিয়ে আমি মুখের সাম্‌নে আড়াল কর্‌ছি, আর আমায় তোমারা দেখতে পা'চ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেই রূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবুও এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পা'চ্ছ না।

(অহঙ্কার ও উপাধি।)

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদেরসব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

এক একটী উপাধি হয় আর জীবের স্বভাব বদ্‌লে যায়। যে কালপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখ্‌বে তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাসখেলা, বেড়াতে যাবার সময়, হাতে ছড়ী, এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, সে অমনি সিস্‌ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌ করে টান্‌ দিতে থাকবে।

(অহঙ্কার ও টাকা।

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হইলেই মানুষ আর একরকম হয়ে যায়; আর সে মানুষ থাকে না।

এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করতো। সে বহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে বেড়াতে গেছলুম। হৃদয়ের সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি, সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে, বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বল্‌ছে, 'কি ঠাকুর! বলি— আছো কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বল্লুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা!' হৃদে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ত্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল, তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগ্‌ল, আর বল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্!' টাকার এতো অহঙ্কার।

(অহঙ্কার কখন্ যায়; ব্রাহ্মজ্ঞানের অবস্থা।)

"জ্ঞানলাভ হলে অহঙ্কার যেতে পারে। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

বেদে আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়, সমাধি হইলেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়, তখন সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, 'একি! একি! তার পর কণ্ঠ, সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুন্‌তে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে মন গেল তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপে সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন কর্‌তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয়, কিন্তু স্পর্শ হয় হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া হয় না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান রয়েছে। সহস্রারের স্থান সপ্তভূমি। সেখানে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।

বিজয়। সপ্তভূমিতে মন পঁহুছিবার পর যখন ব্রাহ্মজ্ঞান হয়, তখন মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে আর পাওয়া যায় না।

"নুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর, কে খপর দিবেক যে নেবে, সে মিসে গেছে। সপ্তভূমিতে মনের নাশ হয় আর সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

আশা-কানন।

দ্বিতীয় সোপান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিদানে ভালবাসা।

সুখের স্বপ্ত—স্মৃতিরবে ভালবাসা তুলনা।

প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় বীর কেশরী মহারাজ ভীষণ দত্ত অপত্য নির্ব্বিশেষে কাশ্মীর রাজ্য প্রতিপালন করিতেছেন। সুক্ষ্মদর্শী ও উদার চেতা সুরজয়সিংহের মন্ত্রনা বলে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে কালযাপন করিতেছে রাজ্য নিষ্কটক ও সুশৃঙ্খলে শাসিত। সুরজয় সিংহ মহারাজের বয়স্য এবং রাজ সংসারের যাবতীয় কার্য্যভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। পাঠক! আপনার সেই পূর্ব্ব পরিচিত উদার তীর বানী অশ্বারোহী যুবক কে স্মরণ করুন ঐ বালা তাঁহাকে বলিয়াছে।

আপনি কাশ্মীর রাজতনয় অমরেন্দ্র সিংহ। সম্প্রতি যুবরাজ অমরেন্দ্র সুরজয় সিংহের স্নেহের দুহিতা ইচ্ছায় পাণী গ্রহণ করিয়াছেন, কাশ্মীররাজ মন্ত্রিপুত্র

অজিতসিংহের বাহুবলে চমৎকৃত হইয়া, সেই দ্বাবিংশবর্ষ বয়স্ক অমিত বলশালী যুবককে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিয়াছেন। এই বিশাল রাজ্যের প্রত্যেক ক্ষত্রিয় বীর সন্তান অজিতসিংহের অসীম বাহুবলে সরল ব্যবহারে ও অপরিমিত সরলতায় চমৎকৃত, সন্তুষ্ট এবং বিমুগ্ধ।

রাজবাটীর পশ্চাৎদিকে কাশ্মীরপতির সুবিস্তৃত প্রমোদোদ্যান। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে উন্নত পাদপরাজী যেন দুরূহ গিরি সমূহের সাক্ষাৎ লাভ লালসায় একাগ্রচিত্তে অনন্তের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। এই বিস্তৃত প্রমোদকানন প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উদ্যানের অপরপার্শ্বে উন্নত প্রাচীরের নিম্নদেশে মহানদঝিলাম কাসীস্বরে প্রকৃতির গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে সাগরাভিমুখে ধাবমান।

দিবা তৃতীয় প্রহর। তপনদেব ক্রমে ক্রমে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিবার ইচ্ছায় পশ্চিম আকাশে অগ্রসর হইতেছেন। আতপতাপ দগ্ধ বিহঙ্গগণ স্বভাবের মনোলোভা শোভা সন্দর্শন করিবার জন্য প্রমোদোদ্যানে সমাসীন হইয়া মুগ্ধ কাকলীরবে প্রকৃতির আশঙ্কা পাইতেছে। দূরবর্ত্তি গিরিশিখর হইতে মৃদুল মলয় হিল্লোলে ধীরে ধীরে গাছের পাতায়, পাখীর প্রাণে, কুসুম বনে অলক্ষে বসিয়া ভাবুকের মন প্রাণ মুগ্ধ করিতেছে।

এই সময়ে কে ঐ অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অতুল রূপলাবণ্যবতী নবীনা রমণী উদ্যানস্থ নিভৃত কামিনীকুঞ্জে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

কামিনীর কমনীয় মুখ মণ্ডলে ঘোর বিষাদ ছায়া পতিত কেন? সরলা ললনা সচকিতে একবার দূরবর্ত্তী অনন্তের পানে নেত্রপাত করিল। তৎপরে আপনার হৃদয়স্থ দারুণ অশান্তির উত্তাপ তরঙ্গাবলী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসে নির্গত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল অনন্ত কি মধুর! হৃদয়ের অশান্তি কি কঠোর যন্ত্রণা দায়ক।

অদূরে নিবিড় নিকুঞ্জের অন্তরাল হইতে আর একটী বালিকা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মচিন্তাভিভূতা বিষাদিনী-বালা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বালিকা ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। পূর্ব্বোক্ত যুবতীর নন্দিনী সচকিত তাঁহারদিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল "ঠাকুর ঝি" তুমি এখানে কখন আসিলে।

পাঠক! প্রথম রমণী মহারাজ ভীমদেওয়ের পুত্রবধূ সজীবশ্রেষ্ঠ সুরজ্‌ সিংহের স্নেহের দুহিতা। দ্বিতীয়া বালিকা নৃপাত্মজা সুহাসিনী। সুহাসিনীও ইচ্ছার ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী ও কামিনীরত্ন। রাজকুমারী যদিও এখনও বাল্যের সীমা অতিক্রম করে না কিন্তু তাহার সুকোমল দেহলতায় যৌবন বিকাশের আর অধিক বিলম্ব নাই। সুহাসিনী চতুর্দ্দশ বয়স্কা অনূঢ়া বালিকা। সুহাসিনী বীরবালা। বালিকা সহাস্য বদনে বলিল "আমি এখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছি তুমি কি ভাব গো বৌ?

রাজকুমারীর নধর অধরে অধর মিশাইয়া ইচ্ছা স্নেহভরে কহিল "তুমি আমার ভাবনা কিরূপে বুঝিলে ভাই?"

"তোমার সুকোমল সুন্দর অঙ্গে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে—মুখে হাসি নাই!—তোমার উদাশ মন আঁখির সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়স্থ দারুণ চিন্তা-রাশির মহিমা প্রচার করিতেছে।" সুহাসিনী গম্ভীর ভাবে এই উত্তর প্রদান করিল।

ইচ্ছা ধীরে ধীরে কহিল, "তুমি আজিও বালিকা, অতএব তুমি কিরূপে যে আমার হৃদয়াভ্যন্তরে কিরূপ দুর্ব্বিসহ জ্বলন্ত দুঃখানল প্রতিনিয়ত হুহু জ্বলিতেছে। আমার মন প্রান যে কিরূপ কিরূপ বুঝিতে পারিবে? যে দিন তোমার ঐ সুনির্ম্মল হৃদয়াকাশে পূর্ণ প্রেমের রস উদিত হইবে, যে দিন আপন প্রান অন্যের সনে প্রেমসূত্রে গাঁথিয়া আপনার হৃদয় নিলয়ে প্রেমের উজ্জ্বল আলোক অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে, সেইদিন অবলা কুল ললনার তাবৎ সুখ দুঃখ অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমিও যখন তোমার মত ছিলাম তখন দিবানিশি মনের সুখে থাকিতাম।"

সুহাসিনী সহাস্য বদনে কহিল সত্য ভাই প্রেমে বড় জ্বালা দেয়।

"তুমি তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে?" রাজবালা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "যাহার হৃদয় আছে সেই অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারে। এই দেখ আমি তোমাকে ভাল বাসি, কিন্তু তোমার ঐ বিষাদপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া আমার মন অস্থির হইতেছে। তুমি আর বৃথা চিন্তায় শোকাকুলা হইও না। দাদা শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। তুমি আমাপেক্ষা শিক্ষিতা ও বয়স্কা; তবে সহসা এত অধৈর্য্য হও কেন? প্রেমিকের প্রেম পূর্ণ পবিত্র হৃদয় যাকে

ঘোর বিরহ বিকার প্রণয়ের দ্বিতীয় অভিনয় তীব্র বিষময়। যদি প্রণয়ে বিরহ না থাকিত তাহা হইলে সংসার তো শান্তির আবাস স্থল হইত। আবার বিরহ না থাকিলে মিলন এত মধুর হইত না। বিরহ যেরূপ যন্ত্রণা দায়ক মিলনও তদনুরূপ মধুর। সুতরাং বিরহে চঞ্চল অথবা অধৈর্য্য না হইয়া সর্ব্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। অসংখ্য রাজদূত দাদার অন্বেষণার্থে বহির্গত হইয়াছে; তুমি অধীরা হইও না, হয় তো তিনি আজই ফিরিয়া আসিবেন।"

ইচ্ছার অধরপ্রান্তে অস্ফুট হাসি দেখা দিল। বিরহিণী রাজবালার চিবুক ধারণ করিয়া গদগদস্বরে বলিল "যাহার তোমার মত গুণবতী ঠাকুর ঝি তাহার ভাবনা কি ভাই?"

রাজকুমারী উৎফুল্ল হৃদয়ে কহিল, "তুমি কাহাকে অধিক ভালবাস?"

"যে আমাকে ভালবাসে, আমিও তাহাকে ভালবাসি।—তুমি কাহাকে ভালবাস ভাই?"

"অগ্রে বল তুমি কাহাকে ভালবাস।"

"তোমাকে?"

"আর কাহাকেও ভালবাসনা?"

"তোমার দাদাকে; এবার বল তুমি কাহাকে ভালবাস?"

সুহাসিনী বলিল "আমিও তোমাকে ভালবাসি।"

ইচ্ছা আবার জিজ্ঞাসা করিল "আর কাহাকে ভালবাস ঠাকুর ঝি!"

"আর তোমার——।" সরলা বালিকা চমকিয়া উঠিল আর বলিতে পারিল না। ইচ্ছা ঘন করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিল।

এই সময়ে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া সেনাপতি অজিতসিংহের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। অগ্রজের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছার আঁধার হৃদয় আশার উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইল। রাজবালা সুহাসিনী সহর্ষে কহি "হয়তো সেনাপতি দাদার কোন সংবাদ লইয়া আসিতেছেন। তুমি তাঁহা জন্য এইস্থানে অপেক্ষা কর আমি একটু অন্তরালে যাই।"

ইচ্ছা হাস্যপূর্ণ বদনে কহিল "এত লজ্জা কেন।" সুহাসিনী বলিল "তুমি তোমার দাদাকে লইয়া সুখে থাক; আমি উপস্থিত থাকিলে, কি জানি যদি— বুঝলে তো?" এই কথা বলিতেং রাজকুমারী সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল

কয়েকদিন হইল রাজকুমার অমরেন্দ্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করেন না। তিনি কোথায় গিয়াছেন কেহই তাহা অবগত নহে, সেনাপতি অজিতসিংহ যুবরাজের প্রাণের বন্ধু আজ সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধুর সহসা অন্তর্ধানে অজিতসিংহের বীর হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সুহৃদবর অজিতসিংহের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া অমরেন্দ্র কদাপি কোন কার্য্য করেন না। কিন্তু এবার মৃগয়া গমনকালে তিনি অজিতকে কোন কথা বলিয়া যান নাই। অমরেন্দ্র কোথায় গিয়াছেন পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

অমরেন্দ্রের সংবাদ প্রাপ্তি আশায় অজিতসিংহ ইচ্ছার নিকট উপস্থিত হইয়া বিষম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কারণ ইচ্ছা স্বীয় প্রিয় প্রাণপতির কোন শুভ সংবাদ প্রদান করিতে পারিল না। বরং অবলা বালিকা অগ্রজের বিষাদপূর্ণ বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল। সেনাপতি তাহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া উদ্যান মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান। প্রকৃতি সুন্দরী রাঙা রবির ছবিখানি লইয়া আর একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল। যেস্থানে রাজকুমারী সুহাসিনী একাকিনী বিরলে বসিয়া কুসুম মাল্য রচনা করিতেছে, অজিতসিংহ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজকুমারি! কাহার জন্য এ সুন্দর মাল্য রচনা করিতেছ?"

সুহাসিনী সচকিতে চাহিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। পরক্ষণেই বলিল, "সেনাপতি! কুসুমোদ্যানে নানাবিধ প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি অবলোকন করিয়া ভাবিলাম যদি মনের মত মানুষ পাই, তবে এই সমস্ত কুসুমে মাল্য রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দিব। হে বীরেন্দ্র! তুমি বিচার করিয়া বল আমার এই স্বকল্পিত ক্ষুদ্র কুসুমহার কেমন হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া রাজবালা সেনাপতির করে সেই সুন্দর ফুলমালা অর্পণ করিল।

সেনাপতি সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, "সুহাস! আমি কি তোমার মনের মানুষ যে আমাকে ইহা অর্পণ করিতেছ?"

সুহাসিনী সলজ্জভাবে কহিল "আমি সে কথা বলিতেছি না, কেমন মালা গাঁথিয়াছি তাহাই দেখিতেছি।"

সেনাপতি হাস্যপূর্ণ বচনে কহিলেন, "দেখিতেছি তোমার মালা রচনা উত্তম হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি সৌরভ ও মধুহীন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই আমার সহিত পরিহাস করিতেছ। দেখ মধুলোভী মক্ষিকাকুল কুসুম সৌরভে আকুল হইয়া উহার উপর উড়িয়া বসিতেছে।" সুহাসিনী এই কথা বলিয়া নীরব হইল।

অজিত কহিলেন, "তোমার কথা শুনিলে হাসি পায়। যদি প্রফুল্ল কুসুমে মধু না থাকিবে, তবে অলি আপন চক্রত্যাগ করিয়া এতদূরে তাঁহার নিকট আসিবে কেন? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিব, বলিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলাম। এক্ষণে যদি তোমার কোন প্রিয়জন থাকে, তবে তাহার গলে এই প্রেমমালা অর্পণ করিয়া পরিশ্রম সফল করিতে যত্নবতী হও।"

সুহাসিনী ঊর্দ্ধগগনে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষাদ ব্যঞ্জকস্বরে বলিল,—"হে বীরসিংহ! কামিনীকুল সহজে অবলা; সুতরাং তাহাদের সাহস অতি অল্প। একজন সহসা কোন কার্য্য করিতে পারে না। হয়তো আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি যাহাকে প্রিয় বলিয়া মনে করি, সে আমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না।—অথবা আমি তাহার একান্ত অপ্রিয়।"

অজিতসিংহ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "রাজকুমারি!—আর কেহ তোমাকে ভালবাসে কি না বলিতে পারি না; কিন্তু একজন তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এবং তোমার শুভ অশুভ আশঙ্কায়—গরল উৎপন্ন হয়,—পাছে প্রিয়জনের কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগে,—পাছে ভালবাসা ফুরাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। আমি ৺মহাকাল মহাদেবের নাম গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি যে বিধাতা ইহজগতে অবশ্যই একরূপ একজন প্রেমিক বীরসিংহের সৃষ্টি করিয়াছেন—যে তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তোমাকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমের পুলকে চিরদিন সুখে অতিবাহিত করিতে চায়। রাজবালা! ক্ষমা করিও অতিরিক্ত বলিলাম বলিয়া বিরক্ত হইও না।"

সুহাসিনী তাঁহার উজ্জ্বল বদনমণ্ডলের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যবদনে কহিল, "সেনাপতি! তুমিও আমাকে ক্ষমা করিও। এক্ষণে বলিয়া

দাও কে সেই মহাপুরুষ যিনি আমাকে আপনার বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করেন।”

সেনাপতি কহিলেন, “সুহাস! তোমার এ প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমবৎ সুন্দর মুখখানি কে না ভালবাসিতে ইচ্ছা করে? আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি এ মহার্ঘ রতন লাভ করিবার জন্য অনায়াসে আত্ম প্রাণ বিসর্জন করিতে পারেন, কিন্তু তোমার আশা ত্যাগ করিয়া জীবনান্ত হইলে মৃত্যুও তাঁহার সুখের হইবে না। তিনিও তোমার ন্যায়—তোমাকে কত কথা বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু পাছে মনের কথা খুলিয়া বলিলে হৃদয়ের আশা পূর্ণ না হয় প্রাণে আঘাত লাগে, এইজন্য আপন ইচ্ছা আপন হৃদয়েই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে—যে মনের কথা খুলিয়া বলে লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। এক্ষণে উর্দ্ধ গগনের অনন্তের দিকে চাহিয়া দেখ সন্ধ্যা সমাগতা। এবং এতাদৃশ নিজ্জন প্রদেশে আমাদের উভয়ের একত্র সম্মিলন উচিত নহে। অতএব তুমি গৃহে যাও—আমিও স্বস্থানে প্রস্থান করি।”

প্রেম ভিখারিণী বিষাদিনী রাজবালা সজল নয়নে কহিল, “সেনাপতি!—তোমার আদেশ একান্ত পালনীয়। কিন্তু শোন; তুমি আমাকে কৌশলে ভুলাইয়া আপনার হৃদয়ের কথা গোপন রাখিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছ। ভাবিয়া দেখ তুমি যাহাকে ভালবাস, সে যদি তোমাকে ভালবাসে তাহা হইলে প্রণয় কত মধুর হয় হে বীরসিংহ! আমি তোমার লুক্কায়িত হৃদয়ভাব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এবং বুঝিয়াছি সেই মহাপুরুষ কেবল বীরসিংহ নহেন—তিনি চতুর ও চোরচূড়ামণি। তিনি অবলার আঁধার হৃদয়ে ধাঁদা লাগাইয়া নাতিদূরে থাকিতে ভালবাসেন। সেনাপতি! সত্য সত্যই কি বিধাতা আমার হৃদয়াকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন? সত্য সত্যই কি তিনি সেই মহাপুরুষ যিনি আকুল হৃদয়া অবলাকে অকূল পাথারে ফেলিয়া কৌশলে পলাইতে চাহিতেছেন? অজিত!—যদি আসিয়াছ তবে যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন?—প্রাণেশ! তুমি কি জান না সুহাসিনি তোমার দেবোপম মোহন মূরতি নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।”

সেনাপতি ধীরে ধীরে কহিলেন, “সুহাসিনী! আমিও তোমার ঐ অপরূপ রূপরাশি—সুধাধার মধুর হাসি দেখিতে বড় ভালবাসি, আমি

কখনও নির্ব্বিবাদে নয়ন ভরিয়া, তোমার ঐ কমনীয় কান্তি অবলোকন করিতে পাই না। কিন্তু রাজকুমারি! তুমি অনূঢ়া,—তোমার সুকোমল দেহ-লতার অলক্ষ্যে যৌবন মুকুলিত হইতেছে। এরূপ স্থলে আমাদের নিভৃত সম্মিলন সাধারণের চক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়।

অবলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার বিরহে হৃদয়াভ্যন্তরে কিরূপ দুর্ব্বিসহ দুঃখাগ্নি-শিখা ধূ ধূ প্রজ্বলিত হয়, প্রেমিকই তাহা অনুভব করিতে সক্ষম। সুহাসিনী অজিতসিংহকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, সেই নয়নরঞ্জন রসিকরতন কোন্ প্রাণে প্রণয়িনীর কোমল প্রাণে আঘাত করিয়া চলিয়া যাইবেন! রোরুদ্যমানা বালিকা করুণস্বরে কহিল, "সেনাপতি! অবলা বালিকার বিমল হৃদয়াকাশে একদিনও এ সুখের চাঁদিমা উদিত হয় নাই; আজ সময় পাইয়াছি,—সুদিন আসিয়াছে, আজ এ তাপিত হৃদয়ের নিভৃত কাহিনী তোমার নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়া দেখিব,—তাহাতে প্রাণের জ্বালা জুড়ায় কি না! হে বীরশার্দ্দূল! হয়তো তুমি আমাকে নির্লজ্জ ভাবিয়া ঘৃণা করিয়া, হয়তো মনে মনে আমার প্রগল্ভতার কত নিন্দা করিবে;—আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে; কিন্তু স্থির জানিও—আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছি;—আর শোন সে ভালবাসা ফুরাইবার নয়। যদিও তোমার সহিত আমার প্রকাশ্যে বিবাহ হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট আমাদের অনেকদিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সুহাসিনী ক্ষত্রিয়-বালা,—কিরূপে সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়, তাহা উত্তম অবগত আছে। সেনাপতি! তোমাকে পতি বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে না পাইলেও,—হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার ঐ দেবাকৃতি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনের সাধে তাহারই পূজা করিব। যদি তাহাতেও মনের আশা, প্রাণের তৃষা, পরিতৃপ্তা না হয়, তবে একান্ত মনে অনন্তের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইব। স্থির জানিও সুহাসিনী অজিতসিংহেরই—তোমারই—আর কাহারও নহে।"

সেনাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—হতভাগ্য অজিতসিংহ কি কাশ্মীর-রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবে, ইহা কখন আশা করিতে পারা যায় না। রাজকুমারি! আমি যে দিন হইতে তোমাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি,

সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই—তোমাকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে ধার করিবার আশা এককালে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু ভালবাসা ভুলিতে পারি নাই। এক্ষণে বুঝিলাম আশা অনন্তরূপিণী।"

অজিতসিংহ এই কয়েকটী কথা বলিয়া, গমনোদ্যত হইলে, সুহাসিনী তাঁহার কণ্ঠদেশে বিচিত্র কুসুমহার পরাইয়া দিয়া সহাস্যবদনে কহিল,—"প্রেম মালা লইয়া যাও,—প্রাণে ব্যথা দিও না।"

সেনাপতি প্রেমভরে তাহার বদনচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"সুখে রও,—স্মৃতি রবে,—মনে রেখো ভুলো না।"

প্রেমবিহ্বলা অবলা বালিকা—তাঁহার সেই প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টি, প্রসন্ন আপনার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিল;—বিরহে—পাপিয়া ডাকি অলি বঁধু বিবাদে ফিরিল।

শ্রীমহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রত্নমালা।

সুজীর্ণ হইলে অন্ন বড়ই সুন্দর।
সুন্দর তনয় যদি হয় গুণধর॥
সুশাসিত পত্নী বটে অতীব সুন্দর।
সুসেবিত সুন্দর নৃপতি নরবর॥
সুচিন্তার উক্তি হয় সুন্দর বিশেষ।
সুবিচারে সুন্দর, কর্ম্মের অবশেষ॥

আগেতে বিষয়, যথা, মানের মৈথুন।
সুখদ প্রথমে শেষে বড়ই বিষম॥

সূচ সম দুষ্টমতি ছিদ্র খোঁজে সদা।
সূত্রবৎ গুণবান্ আনিবে সর্ব্বথা॥
সুজন পরের ছিদ্র দেখিতে না চায়।
দুর্ম্মতি সর্ব্বদা খোঁজে অনিষ্ট উপায়॥

বিষয়ীর তত্ত্বজ্ঞান, চোরের সাধুতা।
লোভীর সংযম শিক্ষা শঠের মিত্রতা॥
কামুকের বৈষ্ণবতা যোধীর বিনয়।
বিশ্বাসে বিশেষ রহিয়াছে প্রত্যবায়॥
হেন অপকার্য্য কিবা আছে এ সংসারে।
কামে বশীভূত জন না করিতে পারে॥

সারল্য সরল সনে কর ব্যবহার।
শঠ সনে শঠতায় কি দোষ তোমার?

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

শরৎ।

পূরবে অরুণ-রেখা এমনি জাগিয়ে ছিল,
এমনি প্রভাত রবি রাঙামুখে চেয়ে ছিল;
এমনি বিজনে ঊষা ঘোমটাটী খুলেছিল;
এমনি নলিনী তা'র মুখখানি তুলেছিল;
এমনি শরতে সেই বরিষা বারিদ-চুল;
লুকাইয়ে ছিল পিছে ধরণী সরমাকুল;
এমনি জগৎ-রূপ, রবি করে ফুটেছিল;
হীরার আঁচলখানি নিশীথ গগনে ছিল।
এমনি—এমনি ভোরে এই আমি এসেছিনু;
অতীত শরতে কোন সমাদরে দিয়েছিনু।
আজো সেই দীপ্তিমাখা দেখি যে নীলিমাকাশ;
আজো সেই শুভ্র-মেঘে শরতের পূর্ণাভাস;
তাই এই আবাহনে আনিয়াছি ফুল ডালি;
ল'বেনা-কি পূজা?—দেবি। লবেনা কি পুষ্পাঞ্জলি?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

আলোচনা

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

চতুর্থ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩০৭ সাল। { দ্বাদশ সংখ্যা।

লেখকগণের নাম—শ্রীহরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীপতিদেব শর্ম্মা,
শ্রীরাইচরণ ধবল, শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীললিতমোহন মণ্ডল ও সম্পাদক।

সূচী।

প্রকাশক—শ্রীচুনীলাল চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়—৮৩ নং পঞ্চাননতলা রোড,—হাওড়া।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র] [প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ আনা।

আলোচনা।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩০৭ সাল। {

ক্ষুদ্র গল্প চতুষ্টয়।

ভ্রমর। (১)

বোঁ ও-ও ও, দেখ, আমি উড়িয়া চলিলাম, কত সুন্দর, কত সুখ! আমার পাখা দেখিয়াছ,—কত রূপ দেখ দেখি, আমার এইটুকু শরীরে অতখানি রূপ উছলিয়া পড়িতেছে কিনা? দেখ, আমি ঘুরিতেছি ফিরিতেছি—সূর্য্যকিরণ পড়ন্ত, তাহাতেই আমার রূপ কত খুলিয়াছে? আমি সুন্দর! তোমরা হয়'ত জান যে, আমি কেবল নিজের ডানার উপর ভর করিয়াই উড়িয়া বেড়াই, একটু রহস্য শুনিবে কি,—বাতাসের সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র পাখার একটু সম্বন্ধ আছে, তাহার সাহায্যে আমি অমন মধুর শব্দ করিয়া উড়িয়া যাই।—দেখ, আমি কুৎসিত দেখিতে পারিনা,—যেখানে রূপ নাই, সেখানে মন টিকিবে কেন? যখন ঘেঁটু ফুল সবুজ ক্ষেত্র আলো করিয়া, বাতাসের কোলে দুলিয়া দুলিয়া, আমায় সোহাগ করে, তখন আমি দূরে ফিরিয়া যাই, আর ওই চাঁপা মাগী, বয়স গিয়াছে, তবুও রঙ্গ ছাড়ে না, তোর তিক্ত মধু আর কি ভাল লাগে? তোমরা হাসিতেছ, হাস, কিন্তু দেখ, কমলের কাছে আর আমি যাইব না, দিনের সঙ্গে সঙ্গে উহার মধু গিয়াছে—যেখানে মধু নাই, সেখানে আমার সম্পর্ক কি? এখন আমি যাইব কোথায় জান, রজনীগন্ধার কাছে, আধ ফুট, আমরি, কত রূপ! আর যূথিকা সুন্দরী, থাক, থাক, পাতার আড়ালে কি লাবণ্যই বিকশিত হইতেছে! গোলাপের কোরক এক একটি দল বিচ্ছিন্ন হইতেছে, মুখখানি খুলি খুলি খুলে না, তোমাদের কনে বউয়ের কত সৌন্দর্য্য জানিনা,—আমার এই গোলাপ

সুন্দরীর সঙ্গে তুলনা দিতে পার? কোথায় গেলে বকুল সুন্দরী? ছি, ছি, এতটা অভিমান করিও না—তোমাকে এখনও আমি ছুঁই নাই, তুমি ঝরিয়া পড়িবে কেন? দেখ, ফুলকুমারীদের আমি বিবাহ করি, মধু লুটিয়া খাই, আর অমনি তাহারা ঝরিয়া পড়ে,—রূপের সঙ্গে সঙ্গে—পরিমলের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরমায়ুও নিবিয়া যায়;—আমি কিন্তু তাহা কখনও ফিরিয়া দেখি না। আমরা ভ্রমর জাতি—বিধাতৃ-বিহিত নিয়ম এই, যতক্ষণ ফুলের মধু থাকে, ততক্ষণ তাহার কাছে ঘুরিয়া বেড়াই, আর যখন মধু নাই, তখন আমি কোথায়? বোঁ ও-ও ও, উড়িয়া চলিলাম।

আ মরণ! বলি ও গন্ধরাজ বালা, মুখখানি খোল না,—একটি চুম্বন সখি,—একটি বিলম্বিত অতি দীর্ঘ চুম্বন! বেলা, দিদিমণি, রাগ করিও না, তোমাকে ছাড়া আমার এক দণ্ড চলে না, দেরী হইয়াছে, আর দেরী করিব না, দাও একটি চুম্বন,—একটু মধু! তোমার মত সুন্দরী কে? তোমার মত গুণ কাহার? ছি সখি, অত অভিমান, এস সখি, একটি কোমল আলি- আঃ, এরই মধ্যে ঝরিয়া পড়িলে, যাও অধঃপাতে, আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি না।

কি ক্ষণস্থায়ী সংসারেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কত রূপ, কত সুধা, কিন্তু কই—দুই দিন যে স্থায়ী হয় না! এখন গোলাপ, তখন ... সন্ধ্যায় যূথিকা সকালে বকুল, কতই না দেখলাম; কিন্তু কই; তুমি কই? বিন্দু বিন্দু জুটাইয়া কত মধুই না সঞ্চয় করিলাম, কত নিত্য নূতন—নিত্য সুন্দর ভোগ করিলাম, কিন্তু যাহা চাই, তাহা পাই কই, আনন্দ কই—তৃপ্তি কই?

রূপ, রূপই আমি চাই। এতকাল কোমল, এতকাল মধুর, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সেবা করিলাম, এখন উজ্জ্বল, তেজোময় চির সুন্দর রূপরাশির অনুসন্ধান করিব। এসো শিখা সুন্দরী, তুমি চঞ্চল বটে, কিন্তু সুন্দর এত রূপ ঐ কালো প্রদীপটার কোলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, দাও সখি, আবার একটি উত্তপ্ত চুম্বন, আমি অতৃপ্ত, আকাঙ্ক্ষিত, দেখ, এতকাল তোমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম!

তার পর,—অন্ধকার!!!

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবীর। (২)

লোহিত চক্ষু—রুক্ষ মূর্ত্তি—অতুল যখন ঘরে আসিয়া হাঁপাইতে, হাঁপাইতে তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল খাইয়া ফেলিল, তখন সকলেই ভাবিল, আজ কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে! নহিলে অতুলের এরূপ ভাব ত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

তারপর অতুল আবার জামার হাতাটা টানিয়া, যখন স্নেহময় জরিজনের চক্ষু হইতে আপনার হস্তস্থিত দীর্ঘ ক্ষত ঢাকিতে যাইয়া তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল—তখন তাহাদের সেই সন্দেহ দৃঢ়তর হইল; অনেক পীড়া পীড়িতে অতুল বলিতে লাগিল,—"ইংরেজ এত কাপুরুষ, তাহা আমি জানিতাম না। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারকে নীচতা ভিন্ন কি বলা যায়?" বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল—বক্ষ স্পন্দিত হইল ক্ষত স্থানে রক্তধারা ছুটিল। যুবক আবার বলিল, "আজ প্রাতে সাহেবটোলায় বেড়াইতে গিয়াছি, নিতান্ত কাতর চীৎকারে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, সমস্ত রাত্রি জাগরণে—মৃতপ্রায় ক্ষীণ- উপবাসক্লিষ্ট—হতভাগা পাখা-কুলির উপর অনবরত এক ক্রোধিত গৌরাঙ্গের সবল মুষ্টিধারা অজস্র বর্ষিত হইতেছে। আমার এই সব দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে বড় দয়ার উদ্রেক হইল—প্রাণ ক্ষেপে হইয়া উঠিল, হতভাগ্যকে অব্যর্থ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য লম্ফ দিয়া ছুটিলাম। সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই সবেগে সাহেবের বক্ষে পদাঘাত করিলাম। সাহেব মেজের উপর পড়িয়া গেল। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের দিকে ছুটিল। আমি ইতিমধ্যে সেই হতভাগ্য কুলিকে বাটী যাইতে আদেশ করিলাম। সে বলিল, সাহেব এখনি আসিয়া আবার আমাকে ধরিবে। আমি বলিলাম, তুমি যতক্ষণ না নিরাপদ হও, ততক্ষণ আমি এইখানে দাঁড়াইয়া সাহেবকে বাধা দিব। সে চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরেই বন্দুক হস্তে আমার সম্মুখীন হইয়াই আমায় লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। প্রথম লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় লক্ষ্য স্থির করিতে না করিতে আমি বন্দুকের উপরে গিয়া পড়িলাম—দ্বিতীয় গুলি আমার প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি বাধায়

কাতর হইলেও সবেগে সাহেবের হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইলাম। সাহেব পুলিশে খবর দিতে গেল।" বলিতে বলিতে তাহার যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল—অতুল বলিল, "একজন ডাক্তার ডাক—গুলি এখনো বিঁধিয়া আছে।" ডাক্তার আসিয়া গুলি তুলিয়া দিলেন। কিন্তু রক্তস্রোত বন্ধ করিতে পারিলেন না। অপরিমিত রক্তস্রাবের সঙ্গে জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তিন ঘণ্টা পরে বাটিতে হাহাকার উঠিল। পুলিশ যখন আসিল, তখন সে পুলিশের অধিকারের বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

এই পরহিতে প্রাণবিসর্জ্জনকারী বাঙ্গালী যুবকের রক্তস্রোতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক-কালিমা কিছু ধৌত হইল নাকি?

শ্রীউপেন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ভ্রান্ত পথিক। (৩)

ভ্রান্ত পথিক, তুমি কিসের আশায় এই বিশাল জগৎ সংসারে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? এই প্রহেলিকাময় কপটতাপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার বাঞ্ছনীয় শান্তিপ্রদ স্থান কোথায়? আর এই অসংখ্য রমণীয় সামগ্রীর মধ্যে তোমার কাম্যবস্তু কি? সকল উচ্চ উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়া এতকাল ধরিয়া তুমি যে দেবদুর্লভ সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেছ, এ পর্য্যন্ত কি তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছ? মরুভূমে মরীচিকা দর্শনে বারিভ্রমে পিপাসিত পথিককুল কতই অশান্বিত হইয়া নিকটে গমন করে, পরে যেমন তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরাশ হয়, সেইরূপ, হে পান্থ! বল্ দেখি, তুমি ইহসংসারে বিচরণ করিতে করিতে কতবার তোমার অদম্য পিপাসা নিবারণাশায় বারিভ্রমে মরীচিকা দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, অবশেষে প্রকৃতির ভ্রুকুটী বুঝিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছ? জগৎ কখন কি তোমার সহিত সরল ব্যবহার করিয়াছে?

তৃষিত পথিক! আর কতকাল এই অন্ধকার ঘোর অন্ধকারময় অবনী মধ্যে অনর্থক বিচরণ করিবে? তোমার মনোমত স্থান কোথাও

নাই। যে পথেই যাও, দেখিবে, জননী প্রকৃতির বর্ত্তমানের সুরঞ্জিত যবনিকা ভবিষ্যতের তমোময় দৃশ্যকে লুকাইত রাখিয়াছে; আর সেই যবনিকা অতিক্রম করিয়াই দেখিবে, সকল দিকই অতিশয় দুর্গম। সেই তিমিরাবৃত দুর্গম প্রদেশে তোমাকে পথ দেখাইবার কেহ নাই। সকলেই আপন আপন কার্য্যে বিব্রত; আর দৈবযোগে যদ্যপি কোন সহযোগী পথিককে তোমার গন্তব্যপথে যাইতে দেখিয়া তাহার হস্তস্থিত ক্ষীণ আলোক অনুসরণ পূর্ব্বক গমন কর, তাহা হইলে অধিক বিপদের সম্ভাবনা; কারণ কিয়ৎদুর গমনের পর যখন সেই আলোক-ধারি পথিক তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইবে, তখন তুমি সেই অপরিচিত স্থানে একা হইয়া পড়িবে, ঘন আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধিক যন্ত্রণা পাইবে। তোমার আর্ত্ত চীৎকার শ্রবণ করিবার জন্য তথায় কাহাকেও পাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, হে পথিক, আর কতকাল ঘুরিয়া বেড়াইবে?

হে আর্ত্ত পথিক, ব্যথিত হইও না। ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাই মানবের প্রতি ঈশ্বরের যুগ যুগান্তরব্যাপী কঠোর শাস্তি। জগৎপিতার এই বিশাল রঙ্গভূমে সকলিই শুধু দু' দিনের জন্য অভিনয়, মানব মাত্রেই এই নাট্যালয়ের এক একজন অভিনেতা অভিনেত্রি। কেবল রঙ্গমঞ্চে বাহ্যিক আবরণে ও বাক্যাড়ম্বরে কেহ রাজা, কেহ সেনাপতি, কেহ ভৃত্য কেহ বা ভিক্ষুক, কিন্তু অভিনয় শেষে নগ্ন দেহে সকলই সমান। তাই বলিতেছিলাম, নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিও, অনর্থক মনকে যন্ত্রণা দিও না। বিশ্বব্যাপী অনন্ত আকাশের নিম্নে তোমার মত কত প্রাণী এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদ্যপি তাহাদের অন্তরের অভ্যান্তরিণ দৃশ্যাবলী দেখিবার উপযুক্ত কোন যন্ত্র থাকে, তবে তাহা দ্বারা দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের হৃদয় কাননের অধিকাংশ চারাগাছ অঙ্কুরিত হইবার পরেই বিনষ্ট হইয়াছে, এখনো যে দুই একটী ক্ষুদ্র লতিকা ফলপুষ্পহীন কণ্টকময় আগাছায় জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারাও মৃত-প্রায়, বারিবিহনে পত্রগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। হয়ত তুমি উহাদের অপেক্ষা অধিক সুখী, তোমার অন্তরে হয়ত আশার বীজ এখনো সরস অবস্থায় আছে; তোমার এই ভ্রমণ হয়ত একেবারে

উদ্দেশ্যবিহীন না হইতে পারে। কিন্তু হায়, অদৃষ্টের তাড়নায় কত অভাগা উদ্‌ভ্রান্ত মনে বাসনা-শূন্য হৃদয়ে চিরজীবন এই সীমাহীন জগতে পর্য্যটন করিতেছে। অনন্ত কালের সাক্ষী চিরপ্রবাহমান শান্তিময়ী জননী জাহ্নবীর অম্বুরাশি বিপুলা ধরিত্রীবক্ষে চিরদিনই প্রবাহিত হইতেছে, দিনে দিনে কত নরনারীর তপ্ত অশ্রু যে তাঁহার সুশীতল পবিত্র সলিলে মিশ্রিত হইতেছে, কে তাহার গণনা করিবে। সংসারের জ্বালাময়ী বিভীষিকাময় দৃশ্য হইতে, চতুর্দ্দিকের বিষাদের অস্ফুট করুণ ক্রন্দন শ্রবণ হইতে অব্যাহতি লালসায় কত নরনারী যে ঐ জাহ্নবী সমীপে আগমন করিয়া তাহাদের মরমের ব্যথা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত জ্ঞাপন করিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? অদৃষ্টচক্রের অন্তহীন আবর্ত্তনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কোটী কোটী জীবগণ নিষ্পেষিত হইতেছে। এই ভীষণ আবর্ত্তনের শেষ নাই, সকলকেই সময়ে সময়ে ইহার কঠিন সংঘর্ষণে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়।

এই পৃথিবীতে আসিয়া অক্ষত শরীরে কে প্রত্যাগমন করিয়াছে? যদি সেরূপ লোক কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি দেবতা। সকলেই অদৃষ্টের দাস। মনুষ্যের কথা কি বলিব, স্বয়ং দেবতাগণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ পর্য্যন্ত অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় দণ্ড পালন করিয়াছেন। দক্ষালয়ে সতীর দেহ ত্যাগের পর দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া অদৃষ্ট বশতঃ দারুণ ক্লেশে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া সুরলোককে পর্য্যন্ত ভীত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সাধ্বী আদর্শ সীতা দেবীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের প্রিয় পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে সামান্য নরগণ হস্তে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর অধিক উদাহরণের আবশ্যকতা নাই; ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি আজীবন অদৃষ্টের সহিত অশ্রান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে, কিন্তু কখন জয়ী হইতে পারে না। বিশ্বনিয়ন্তা অদৃষ্ট যুদ্ধে জয়ী হইবার উপযুক্ত কোন অস্ত্র সৃজন করেন নাই।

শ্রীহরিহর শেঠ।

মহাজন। (৪)

[১]

হরিপুর গ্রামে প্রিয়নাথ মুখোর বাড়ী। প্রিয়নাথ কেরাণী, সরকারি আফিসে কাজ করেন, মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর।

আজ রবিবার। বৈশাখ মাস। বেলা ৮ টার সময় প্রিয়নাথের বাড়ীখানির একখানি ঘরে, তাঁহার একমাত্র তিন বছরের পুত্র খেলা করিতে ছিল। তাঁহার স্ত্রী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সংসারে তাহার শাশুড়ী ঠাকুরুণ থাকিতেন—তাঁহার আর কেহ ছিল না—তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতার সংসারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

বাড়ীখানি দশ বিঘা পরিমাণ লাখরাজ জমির মধ্যস্থলে। চারি কাঠার উপর ঘরগুলি—বাকি জমিতে বাগান ও পুকুর। বাগানে নানা প্রকার ফলের গাছ। বাগান ও পুকুরটিতে প্রিয়নাথের সংসার চালাইবার বিশেষ সাহায্য হইত।

ছেলেটি আপন ছোট জুতা জোড়াটা ফেলিয়া দিয়া, আপন পিতার জুতা জোড়াটি লইয়া পায়ে দিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যাইতেছিল। প্রিয়নাথ ঘরের সংলগ্ন দালানে বসিয়া বালকের খেলা দেখিতেছিল এবং স্বচ্ছন্দে তামাকু সেবন করিতেছিল। বালকের পবিত্র খেলা দেখিবার জিনিস বটে! এমন সুখের সময় আর নাই। সংসারের নানা রকম ভাবনা চিন্তা বালকের পবিত্র মনের নিকট পৌঁছিতে পারে না—বালক পূর্ণ আনন্দের রাজা।

এতক্ষণ বালক পিতাকে দেখিতে পায় নাই—আপন আনন্দে বিভোর হইয়া মহাকলরব করিতেছিল—যুবার মৃদুমন্দ রোলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। সহসা বালকের দৃষ্টি পিতার দিকে পড়িল—বালক আপন খেলা ফেলিয়া পিতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা! পাখী কিনে দেবে না?" প্রিয়নাথ বালককে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, পাখীকে আটকে রাখতে নেই।" "কেন বাবা?" বালক কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "পাখীর মা তা হলে ভারি কাঁদবে।" পিতার

উত্তর শুনিয়া বালকের চক্ষে জল আসিল—সে বলিল, "বাবা, মা কাঁদবে—তবে পাখী ধরবো না—"

[২]

পিতা পুত্রে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে একজন ডাকিল, "প্রিয় বাবু!" প্রিয়নাথ খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া দেখিলেন, গোকুল রায়ের ভৃত্য রামসিং দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করায়, রামসিং বলিল, "বাবু বোলাচ্ছেন" রামসিং হিন্দুস্থানী, কিন্তু বহুদিন বাঙ্গালাতে থাকিয়া পাঁড়ের হিন্দুস্থানীত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ডাক্‌চেন?"

রামসিং।—টাকার তাগাদা—

প্রিয়। সেকি! কেবলমাত্র কুড়ি টাকা বাকি—এখনও ত মাহিনার সময় হয় নাই—মাহিনা পাইলেই সমস্ত পরিশোধ করিব—

রামসিং কথাগুলি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল—পরে প্রিয়নাথকে চুপি চুপি কি কথা বলিল। শুনিয়া প্রিয়নাথ চিন্তিত হইলেন।

যাহা হউক, খোকাকে বাড়ির ভিতর রাখিয়া, প্রিয়নাথ গোকুল রায়ের বাড়ির দিকে চলিলেন।

এদিকে খোকা অভিমান বশতঃ মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিল। দিদি মা ও মা গৃহ কার্য্য ছাড়িয়া "খোকনের" সান্ত্বনার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। বাঘের গল্পে, ভূতের গল্পে, খোকার মনস্তুষ্টি হইল না। শেষে খোকার শশুর বাড়ীর গল্পের অবতারণা করা হইল। গল্পটি এমন জমিয়াছিল যে শেষে "খোকনের" মনস্তুষ্টি হইয়াছিল এবং খোকা অভিমান ভুলিয়া পুনরায় আপন খেলাতে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া দিদিমা ও মাকে গৃহকার্য্যের জন্য অবকাশ দিয়াছিল।

[৩]

গোকুল রায় সামান্য অবস্থা হইতে বেশ দুপয়সা সঞ্চয় করিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে গোকুলের অবস্থা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঠিক সৎ উপায়ে গোকুলের অর্থ হইয়াছিল, একথা বন্ধু বান্ধবেরাও বলিতে সাহস করিত না।

গোকুলের বয়স ৫০ বৎসর, দেখিতে বলিষ্ঠ। তাহার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী। বাহিরে ধর্ম্মের ভান ষোল আনা। গোকুলের চরিত্র ভাল ছিল না। সময়ে সময়ে গোকুল অনেক প্রকারে স্বগ্রামে লাঞ্ছিত হইয়াছিল—এইরূপ শোনা যায়।

প্রিয়নাথ যখন পোঁছিলেন, তখন গোকুল আপন বাহির বাটীর ছোট খাট দালানে নামাবলী গায়ে দিয়া একখানি মৃগচর্ম্মে বসিয়াছিল। চক্ষু দুটি মুদিত ছিল। রামসিং অন্যত্র চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে গোকুল চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এসেছ, ভালই, আমার একটি কথা আছে।"

প্রিয়। আজ্ঞা করুন—

গো। তোমার শাশুড়ী অতীব অভদ্র বংশের—

প্রিয়। কেন মহাশয়?

গো। তাহাকে তোমার বাড়ী হইতে আজই তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

প্রিয়। সেকি কথা! তিনি কি দোষ করিলেন?

গো। সে দিন তোমার পুকুর পাড় দিয়া আমাকে যাইতে দেখিয়া তোমার শাশুড়ী আমাকে যারপর নাই গালাগালি দিয়াছে, তুমি কি শুন নাই?

প্রিয়। শুনিয়াছি।

গো। শুনিয়াছ—তবে কেন কিছু বল নাই?

প্রিয়। তিনি বলিলেন—আমার পুকুরে উত্তর বাড়ির বড় গিন্নি স্নান করিতেছিলেন—আপনি সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন—সেই জন্য—

গো। কথাটা তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল?

প্রিয়। আমাকে ক্ষমা করিবেন—অভিযোগটা সত্য আমার বিশ্বাস হইয়াছিল—সেইজন্য—

কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে, গোকুল অগ্নি শর্ম্মা হইয়া বলিল, "তুমি কৃতঘ্ন? তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় তোমাকে পাঁচশত টাকা কর্জ্জ না দিলে তুমি শুদ্ধ হইতে পারিতে না—তাহার প্রতিফল এই!"

প্রিয়নাথ অতীব ধীরভাবে বলিলেন, "আপনি কর্জ্জ দিয়া আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন—কিন্তু আমার বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন—বলিয়াছিলাম—কোন অপরাধ হইয়াছে বিবেচনা করেন, আমাকে ক্ষমা করিবেন—

বিকট হাস্য করিয়া গোকুল রায় বলিল, "ক্ষমা টমার কথা থাক—আমার প্রাপ্যগণ্ডা আজই চুকাইয়া দিবে—"

প্রিয়নাথ ধীরভাবে বলিলেন, "সমস্ত পরিশোধ করিয়াছি, কেবলমাত্র কুড়ি টাকা বাকি, এই মাসেই পরিশোধ করিব—"

আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া গোকুল রায় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ বাহির দিকে আসিলেন।

[৪]

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দশ দিন পরে প্রিয়নাথ আফিস যাইবার জন্য সবে মাত্র বাটির বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময়ে স্থানীয় চৌকীর মোনসফ আদালতের পিয়াদা প্রিয়নাথের হস্তে একখানি আর্জ্জির নকল ও একখানি সমন দিল। আর্জ্জিতে দাবি—৬২০ টাকা। পড়িয়া প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। পিয়াদা চলিয়া গেল। কি করিবেন, প্রিয়নাথ ভাবিতেছিলেন। খতের পৃষ্ঠে আসলের মধ্যে ৪৮০ টাকা ও সুদ ১০০ টাকা মাসে মাসে উসুল দিয়া লইয়াছিল, এজন্য পৃথক রসীদ লন নাই।

পাঁচ মিনিট পরে আর একজন পিয়াদা ও একজন ঢুলী আসিয়া প্রিয়নাথের বাড়ি ও বাগান এস্তাকাল ক্রোক করিয়া গেল। ঢোল বাজিলে বাড়ির সকলে বাহির হইয়া আসিল। প্রিয়নাথ পিয়াদাকে জিজ্ঞাসা করায় পিয়াদা বলিল, "বাবু! নালিস হয়েচে খবর পেয়ে আপনি এ সব বেচে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন—তাই আদালত ক্রোক করবার হুকুম দিয়েচেন—কোন আপত্তি থাকে, চৌকিতে গিয়ে উকীল বাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।"—পিয়াদা ও ঢুলী চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ বাড়ীর ভিতর আসিলেন। স্ত্রী ও শাশুড়ী কাঁদিয়া আকুল—খোকা কান্না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খানিক পরে প্রিয়নাথ বলিলেন, "আমি আজকার জন্য ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে আজই উকীলের বাসাতে যাব, দেখি ধর্ম্ম কি করেন। পরে শাশুড়ী ও স্ত্রীকে অনেক প্রকার উৎসাহের কথা বলাতে তবে তাহারা সে দিনকার মত অন্ন স্পর্শ করিল।

অনন্তর কিছু পুঁজি লইয়া প্রিয়নাথ চৌকীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

[৫]

বেলা দুটার সময় প্রিয়নাথ চৌকীতে পৌছিলেন। চৌকীতে একলা মোনসফ। একটি থানা আছে, সব রেজিষ্টারি আছে। মোনসফ বাবুর বাসা আদালতের নিকট। তাঁহার আফিস ঘর বড় ভাল নয়। আহারীয় দ্রব্য ভাল পাওয়া যায় না, কষ্টে দিন কাটাইতে হয়, কিন্তু বিলক্ষণ "পয়সা জমে" এই সুবিধা। একটি নেটিভ ডাক্তার আছেন, তাঁহার পসার মন্দ নয়।

দশ জন উকীল আদালতে কাজ করেন। তাঁহাদের বাসা নিকটে।

প্রিয়নাথ আদালত ঘেঁসা লোক ছিলেন না। তিনি একজন উকীলকে আরজিখানি দেখাইলে তিনি বলিলেন, "আমি বাদীনীর পক্ষে আছি। গোকুল রায়ের সমস্ত তেজারতি চলে আপন চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর নামে। উকীল বাবুটি বলিলেন, "পাঁচজন উকীল বাদিনীর পক্ষে আছেন।" প্রিয়নাথ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তবে কাকে দিব।"

উকীল। একজন উকীলের নাম করিয়া এবং তাঁহার সেরেস্তা দেখাইয়া দিয়া আপন কাজে চলিয়া গেলেন। প্রিয়নাথ সেই উকীল বাবুর সেরেস্তাতে গিয়া উকীল বাবুর নিকট বসিলেন, এবং কাগজগুলি উকীল বাবুর হাতে দিলেম।

উকীল প্রিয়নাথের সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া সেই মর্ম্মে জবাব তৈয়ারি করিলেন এবং সেই দিনই সাক্ষী মানিবার জন্য প্রিয়নাথকে উপদেশ দিলেন। প্রিয়নাথ বলিলেন, "সময় পাইব না?"

উকীল। রেজিষ্টারি দলীলের মোকদ্দমাতে বর্ত্তমান মোনসফ বাবু কিছুতেই সময় দেন না—আজই সাক্ষী আনা চাই।

প্রিয়নাথ। সাক্ষী আর কে আছে বলুন। বাদিনীর স্বামী গোকুল রায়ই আমার সাক্ষী—

উকীল। আর কোন সাক্ষী নাই?

প্রিয়নাথ। না।

পরে আদালত নাম দাখিল হইল এবং বর্ণনাপত্রও দাখিল হইল উকীল নথি দেখিয়া আসিয়া প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে শমন পাইয়াছেন

প্রিয়। আজই—

উকীল। ৮ দিন পূর্ব্বে সমন জারি হইয়াছে রিটর্ণে লেখা আছে—

প্রিয়। সর্ব্বনাশ!

উকীল। তাহাতে কিছু ভয় করিবেন না। আপনি এস্তাকাল ক্রোক সম্বন্ধে কিছু আপত্তি করিতে চান?

প্রিয়। ইচ্ছা আছে। বাদীনীর পক্ষে যে দরখাস্ত করা হইয়াছে দরখাস্তের উক্তিগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা—

উকীল। কিন্তু জামিন দিতে হইবে—

প্রিয়। তবে—আপত্তি করিবার ইচ্ছা নাই, যাহাতে মোকদ্দমাতে জয় লাভ হয়—সে পক্ষে ব্যবস্থা করুন—

গোকুল রায়কে সাক্ষী মানা হইল। তদ্বিরাদি সমাধা করিয়া প্রিয়নাথ নিজ ভবনের দিকে রহনা হইলেন। "সত্যের জয় অবশ্য হইবে" একথা সমস্ত পথ প্রিয়নাথের মনে জাগিতেছিল।

[৬]

মাঝের কয়দিন বিষম উদ্বেগে কাটিয়া গেল। প্রিয়নাথের শাশুড়ী সদাই চিন্তিত থাকিতেন, প্রিয়নাথের স্ত্রীও সদাই চিন্তা করিতেন। খোকা সকলকে ভার ভার দেখিয়া কেবল কাঁদিত—কেন কাঁদিত, কেহ বুঝিতে পারিত না।

কয়দিন অতি কষ্টে কাটিয়া গেল। হরিপুর গ্রামে মোকদ্দমা সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলা বলি করিয়াছিল। গোকুল রায়ের নিকট অনেকের টিকি বাঁধা, কেহ সাহস করিয়া মিটাইবার প্রস্তাব গোকুলের নিকট করিতে পারে নাই। গোকুলের জিদ ক্রমশই বাড়িতেছিল। প্রতিবাদীর পক্ষের সন্ধান পাইয়া তাহার "জিদের" ইয়ত্তা ছিল না।

ধার্য্য দিনে প্রাতঃকালেই প্রিয়নাথ আদালতের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেদিন প্রিয়নাথের উদরে একবিন্দু জল পড়ে নাই। তাঁহার স্ত্রী ও শাশুড়ী উপবাসে ছিল, কেবলমাত্র খোকা কিছু খাইয়াছিল।

যথাসময়ে "কাদম্বিনী বনাম প্রিয়নাথ মুখো" কেস পেশ হইল। গোকুল রায় আর তাহার দু চারি জন অনুগত লোক আদালতে উপস্থিত ছিল।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। বাদিনীর পক্ষে পাঁচজন উকীল উপস্থিত।

একজন উকীল বলিলেন, "খত স্বীকার, উশুলের আপত্তি, অতএব প্রমাণ ভার প্রতিবাদীর উপর—" বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতিবাদীর পক্ষে কয়জন সাক্ষী উপস্থিত ?"

প্রতিবাদীর উকীল। প্রতিবাদী স্বয়ং ও বাদিনীর স্বামী গোকুল রায়। মূল দলীলখানি খোয়া গিয়াছে, আমরা স্বীকার করি না। নষ্ট হওয়ার কথা বাদিনীর পক্ষে প্রথমে প্রমাণ হওয়া উচিত—মূল খতের পৃষ্ঠে প্রায় সমস্ত টাকার উসুল আছে—উড়াইয়া দিবার জন্য দলীল খোয়া গিয়াছে, এ উক্তি করা গিয়াছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীহরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাপ।

মহারাজ্ঞ্যা দ্যুলোকগমন বিলাপঃ।

অহো কিমদ্য দুর্দিনমাপতিতম্।

হা ভারতেশ্বরি ! হতান্ সুতনির্বিশেষা—
নেতান্ জনানিহ বিহায় দয়াবিহীনা।
কুত্রাগমোহস্ত হি হঠাদ্ বদ বা বদান্যে !
মাতস্ত্বয়া বয়মপি ত্বরয়া প্রয়ামঃ ॥ ১ ॥

মাতর্মূর্ত্তে সকলরাজগুণাভিরামে !
রামাদিরাজচররাজ্ঞি ময়ে ! বিজেত্রি !
রাত্রিন্দিবং জনমনোমদরক্ষিত্রি ! জৈত্রি !
চন্দ্রাভিভাবিনি ! গুরুং কিমকুর্ম মন্তুম্ ॥ ২ ॥

তস্মাচ্চ কিন্নু পরিহৃত্য সুতানকাণ্ডে
পাপানিমানয়ি গতাসি হতাদরা ত্বম্।
নো চেৎ কথং চপলময় ! ধরাং বিসৃজ্য
লোকান্তরং গতবতী ননু সর্ব্বমাতে ! ৩ ॥

এবং ত্বদস্ত ধরণীভরণৈকতন্ত্রে !
স্নেহৈশ্চিরার্দ্রহৃদয়ে ! ননু কিংপ্রজানাম্।

গল্প চতুষ্টয়ের মধ্যস্থিত বঙ্গবীর নামক প্রবন্ধের যাবতীয় ঘটনা কাল্পনিক জানিবেন। আং সং।

স্নেহং গরিষ্ঠ মচিরং তমশেষ মম্ব!
সন্ন্যাসিনীব খলু বিস্মরসি স্ম চিত্রম্॥ ৪।
কিম্বা তবাত্র নহি দোষকণোহস্তি কশ্চিৎ
পুত্রান্তরে! বহুভবান্তরলব্ধকর্ম্ম।
গর্ব্বং হি নঃ পুনরিমং ব্যদধাদনর্থং
সর্ব্বঃ প্রভু ভবতি কালবলং হি লব্ধঃ॥ ৫॥
অত্রাথবা খলু বিধে! ত্বময়ে নিদানং
ধিক্ ত্বামতো হতবিবেক কৃতিস্নকালে।
ক্ষ্যামণ্ডলং কিল চিরং পরিপালয়ন্তীং
হিত্বা স্বকীয়সুখমেবচ, যোহস্যাহার্ষীঃ॥ ৬॥
হা হা সুদারুণবিধে! কিমিদং সুদুষ্টং
কর্ম্মাকরোঃ সপদি, পূর্ব্বমিমাং ন হত্বা।
অস্মানিমান্ হতবিধীন্ যদনাশয়িষ্যো
দুঃখং তদৈতদবলোকয়িতুং ন শক্যম্॥ ৭॥
রে পশ্য সম্প্রতি যদাপদি বালবৃন্দং
স্তন্যং ন বা পিবতি মাতৃরলক্ষ বাস্পম্।
মুঞ্চত্যজস্রমপি মাতর এব বালান্
মত্তা ইব প্রবিচরন্তি বিসৃজ্য নৈজান্॥ ৮॥
বৃদ্ধা বিহায় চ হরে র্ভজনং সদৈবা—
ভ্রান্তং জড়াইব ভবন্তি তথা যুবানঃ।
অন্যোহন্যরাগজনিতব্যবসায়বর্জং
চেতোনিবিষ্ট বিষদিগ্ধ বিশল্যতুল্যাঃ॥ ৯॥
বিপ্রাশ্চ বেদবিহিতং স্মৃতিসম্মতঞ্চ
নিত্যং সুকর্ম ন চরন্ত্যপরে চ বর্ণাঃ।
স্বং স্বং বিধেয়মপহায় হি বৈমনস্য—
ব্যাপ্তা বরাকচরিতং ভৃশমাচরন্তি॥ ১০॥
গাবোহপি শস্পকবলাদিকমাশ্বপাস্য
দীনাং দৃশং হি পরিতো বিসৃজন্তি হন্ত।
বৃক্ষাদয়োহপি ফল পুষ্পদলাদিভারং
তন্বন্তি নো নবনবঞ্চ পুনস্তথৈব॥ ১১॥

মূকা ইবাবনিতলে চ পতত্রি পঙ্‌ক্তি—
রাস্তে তরোঃ শিখরদেশমপাস্য মঙ্কুম্।
ধ্বানং শ্রীজাতিমুলভং ত্বহহ প্রকামং
স্বাহারমিচ্ছতি ন বা সময়েষু সৈব॥ ১২॥
বাতাস্তথা ন চ বহন্তি হহা ন চেন্দুঃ
পর্ব্বণ্যাপি স্ফুরতি পূর্ব্ববদত্র কালে।
সূর্য্যস্তথা কিরণজালমহো ইদানীং
নাবিষ্করোতি তিমিরাবলিবারণায়॥ ১৩॥
কিমেতহধিকং হতবিধে! কথয়ামি দুঃখং
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড বিবরে কিমপীহ নাস্তে।
এতর্হি যৎখলু হহে বিপরীতভাবং
নো বা দধাতি বসুধাধিপতেৰ্বিপত্তৌ॥ ১৪॥
মহামান্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথন্যায়ভূষণান্তেবাসিনঃ
কৈথোড়নিবাসিনঃ শ্রীশ্রীপতি দেবশর্ম্মণঃ।

প্রেম।

সখিলো! কর নিরীক্ষণ কালীয়া চাঁদে,
দাঁড়ায়ে কদম্বতলে মোহনীয়া ছাঁদে।
আহা মরি! কি মাধুরি মন হরে হেরে,
চিত চুরি করি হরি ফেলাইল ফেরে।
ত্রিভঙ্গ হইয়ে কালা করে কত রঙ্গ,
(বলে) হে কিশোরী দয়া করি কর মম সঙ্গ।
চাঁচর চিকুরে সখি নিরখি নয়নে,
মোহি পিক্ কুহুরবে কান্ত আগমনে।
বল সখি পাখীমন মোহে যারে হেরি
(আমি) হয়ে নারী তারে হেরি রহিতে কি পারি।
তদুপরি হের সখি চূড়া মনোলোভা,
যাব সনে শিখী-পাখা পাইতেছে শোভা।

বামেতে হইয়ে হেলা কহিছে আমায়,
ও কিশোরী এই দিকে রাখিব তোমায়।
শ্রীমুখ শরৎ ইন্দু সম শোভা পায়,
বিরহিণী চকোরিণী মরি হায় হায়।
মনে হয় ও মুখের সুধা করি পান,
সুখেতে জুড়াই সখি তাপিত পরাণ।
দেখ সখি শ্যাম ভুরু কাম শরাসন,
শর হয়ে কটাক্ষ রয়েছে নিয়োজন।
ধর ধর ধর উহু উহু মরি সই,
অবলা পাইয়ে মোরে বিঁধিতেছে অই।
কি করি পাইব শ্যামে বলনা বল না,
মিলাও শ্যামের সনে ছাড়িয়া ছলনা।
দেখ সখি শ্যাম-করে মোহন বাঁশরী,
ডাকিছে আমায় কাছে এসলো কিশোরী।
এতে কি পাশরি সই সে মনমোহনে,
না পাইলে না রাখিব এ ছার জীবনে।
শ্যাম সরোবর মাঝে আমি লো হংসিনী,
সাঁতারিব প্রেমনীরে হয়ে আহ্লাদিনী।
"কি করি পাইব শ্যামে" ভেবে নিরুপায়,
মিলাও শ্যামের সনে" ধরি তব পায়।
একেত ও শ্যামরূপ অনঙ্গ মোহন,
অঙ্গধারী অঙ্গনার মজিবে না মন।
সে মন কেমন সখি না পাই ভাবিয়া,
না মজে যাহার মন এমন দেখিয়া।
শ্যামেরে রাধার মন রাধা মন শ্যাম,
মিলায়ে শ্যামের সনে পূর্ণ কর কাম।
জেতে মারী পারি কিলো সহিতে যাতনা,
শ্যাম বিনে প্রাণ মম রহে না রহে না।
যাও যাও সখি নিরখিয়ে মম গতি,
উপায়েতে শ্যামচাঁদে কর মম পতি।

আলোচনা

চতুর্থ ভাগ—চতুর্থ বর্ষ।

(১৩০৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২শ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

Published by the Proprietor & Manager

DURGA DASS CHATTERJEE

From the Alochona Office. Howrah.

কলিকাতা ;

৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে

শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।] [ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

শ্যামচাঁদ পতি মম শ্যামচাঁদ গতি,
ত্বরিতে করাও সখি শ্যাম সনে রতি।
প্রাণ সই জে'নে তোর কই এই কথা,
আশা করি ঘুচাইবি মম মন-ব্যথা।
কি ছার মিছার আর আছে জাতি কুলে,
কুলমান দিনু শ্যামে যমুনার কূলে।
তা বিনে একুলেঁ মম কিবা আছে কাজ,
অকূলে ভাসিব কিলো লয়ে কুল লাজ।
মম মন জানি সখি করিয়ে গমন,
শ্যামের চরণে সব কর নিবেদন।

শ্রীরাইচরণ ধবল।

আলোচনা।

আ—মার বাসনা মনে কাব্য আলোচনা,
লো—লিত হাসিয়ে মৃদু জাগিছে কল্পনা।
চ—পলা চমকে আসি দেহ দরশন,
না—চলো মোহন বেশে ভুলাইয়া মন।
শ্রী—যুত অযুত শোভা প্রকৃতি ভূষণে,
ম—ন মাঝে নানা মতে আনলো ললনে।
ন—য়ন রঞ্জন শ্যাম প্রান্তর কানন,
ম—ন লোভা শোভাময় তরুলতাগণ।
থ—রে থরে ফুল্ল ফুল সৌরভ ছড়ায়,
না—না দিকে বহি যায় মানস মাতায়।
থ—র থর কাঁপে ফুল সোহাগের ভরে,
মু—গ্ধ অলি মধু পানে, হরিষে গুঞ্জরে।
দো—লা প্রাণে পাখিগণ গায় সুললিত,
পা—পিয়া কোকিল আদি ভুলাইয়ে চিত।
ধ্যা—ন ভঙ্গে শীত অন্তে বসন্ত বিকাশ,
র(অ)—নন্ত মাধুরি হেরি পুরেনাকো আশ।

র—চিয়ে এ শোভা কেবা স্বভাবে সাজায়,
চি—ন্ময় দেখ তাঁর জ্ঞানের প্রভায়।
ত—রিতে সংসার, তিনি ভব কর্ণধার,
ওঁকার রূপেতে ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

"ভবে কি আছে আমার?"

১

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
এসে দুদিনের তরে, খেলা করি খেলা ঘরে;
খেলা সাঙ্গ হলে, ফিরে যাব পুনর্ব্বার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

২

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
একাকী এসেছি ভবে, একাই যাইতে হবে;
পড়ে রবে সাজ শয্যা সোণার সংসার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৩

আপন বলিতে ভবে, কি আছে আমার
এই যে সংসার মায়া, পিতা মাতা পুত্র জায়া;
কালে স্নেহ ভুলে যাবে, কেহ নয় কার,
আপন বলিতে ভবে, কি আছে আমার?

৪

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
আমোদ প্রমোদ মিলি, যাহারে আত্মীয় বলি;
ভেবে দেখ সময়েতে সেকি আপনার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৫

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
আপন কেহ না ভবে, সকলেই পর হবে ;
সকল(ই) নয়ন মুদিত হলে সকলি আঁধার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার ?

৬

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
অচেনা প্রদেশে আসি, পাই কত প্রতিবাসী ;
(তারা) দিনেক দুদিন পরে ভুলিবে আবার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার ?

৭

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
যারে আমি করি স্নেহ, সে মোর পোড়াবে দেহ ;
অনলেতে পুড়ে আমি হব ছার খার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার ?

৮

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার
একমাত্র বিশ্বপতি, তিনি অগতির গতি ;
যেবা করে চরমেতে ভব-নদী পার
আপন বলিতে "তিনি" আমা অভাগার !

শ্রীললিতমোহন মণ্ডল।

চতুর্থ বর্ষ সম্পূর্ণ।

গোলাপ ফুল।

বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন, গোলাপফুলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ অতুলনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্ট যত প্রকার সুন্দর বস্তু আছে, বোধ হয়, তন্মধ্যে গোলাপ ফুল সকলের শ্রেষ্ঠ। আরও অনেক প্রকার ফুল দেখা যায়, যাহা সৌন্দর্য্যে গোলাপ ফুলের মত, কিন্তু একাধারে সৌন্দর্য্য ও মন-মাতান সদ্গন্ধ বুঝি আর কোন ফুলের নাই। কি দেব পূজায়, কি প্রেমিক প্রেমিকার উপহারে, কি বিবাহে, কি উৎসবে প্রধান অঙ্গ গোলাপ ফুল। ব্যথিতের ব্যথা, শোকাতুরের শোক, বিরহির বিরহ, যে একটী সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল ক্ষণেকের জন্যও ভুলাইয়া দেয়, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। গাজিপুর ইস্তাম্বুল, কনষ্টাণ্টিনোপল একমাত্র গোলাপের জন্যই জগৎ-বিখ্যাত। একমাত্র গোলাপ ফুলের নিমিত্তই বৈদ্যনাথে মেল্ থামে। গোলাপ ফুল ঔষধার্থেও ব্যবহার্য্য। গোলাপফুলের পাপ্ড়িগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে ধারক এবং শর্করাসহ মিশাইয়া "গুলকন্দ" হয়, ইহা "মৃদু বিরেচক।" স্নানের পর প্রতিদিন নিয়মিত গোলাপজল ব্যবহার করিলে যাবতীয় শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। এমন যে প্রিয়বস্তু চক্ষু, তাহার যাবতীয় পীড়ায় গোলাপজল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের বাগানে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হইতে উৎকৃষ্ট গোলাপ জল প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। ব্যবসায়ীদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। শুনা গিয়াছে যে, আমেরিকার কোন এক প্রদেশের পাগলা গারদের পাগলদিগকে গোলাপ ক্ষেতে কাজ করিতে দেওয়া হইত। গোলাপের সদ্গন্ধে তাহাদের মন প্রফুল্লিত ও মস্তিষ্ক শীতল থাকাতে অল্প দিনের ভিতরেই তাহাদের মধ্যে অনেক লোক অনেকাংশে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। অতএব দেখুন, গোলাপফুল আমাদের কিরূপ প্রয়োজনীয় বস্তু। উদ্যান সাজাইবার উপযুক্ত প্রায় ৩৫০ প্রকারের গোলাপের কলম "পারিজাত-নার্শারিতে" পাওয়া যায়। তাহাদের বিবরণ মূল্য তালিকায় দেখুন।

হেড আফিস—হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পারিজাত নার্শরির

"বাগান" মাণিকতলা, কলিকাতা। একমাত্র স্বত্বাধিকারি

শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ, আর, এইচ, এস।

সূচীপত্র ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।